দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া-রাহুলের আচরণ সন্দেহজনক— পৃঃ ১৬

ড্রাগনের বিষে জর্জরিত শ্রীলঙ্কা — পৃঃ ২৩

৭৪ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা।। ২৫ জুলাই, ২০২২।। ৮ শ্রাবণ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

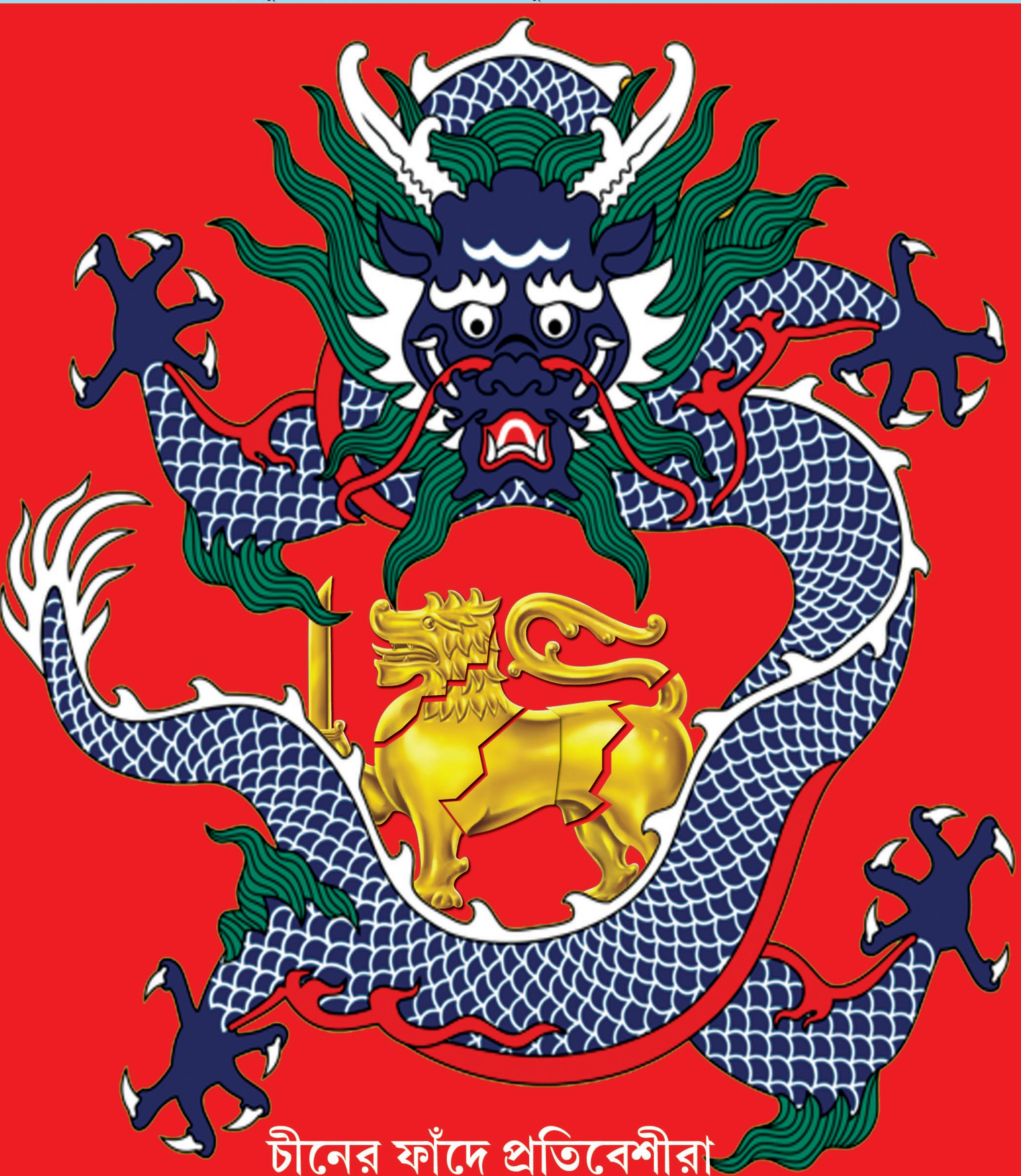

চীনের ফাঁদে প্রতিবেশীরা

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**
E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, ৮ শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

২৫ জুলাই - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

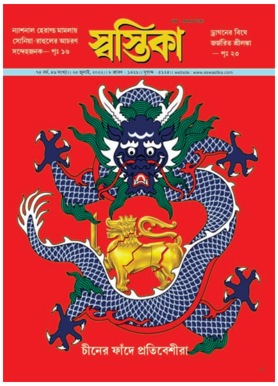

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

ধনকড় বিদায়ে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো মমতার, তবে সামনে আরও বড়ো বিপদ ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

তুমি কোন কাননের মুকুল ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

পড়শি দেশ শ্রীলঙ্কার বিপর্যয় দেখে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ভারতের সজাগ থাকা দরকার ◻ স্বামীনাথন আইয়ার ◻ ৮

জেহাদি সন্ত্রাস প্রতিহত করতে জোটবদ্ধ হিন্দু সঙ্ঘ গড়ে তোলা আশু প্রয়োজন ◻ বরুণ মণ্ডল ◻ ১০

বান্দার মুখে ঘাতকের মুখোশ ◻ অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায় ◻ ১১

চব্বিশে কী হতে পারে তার ইঙ্গিত বাইশেই দিচ্ছে বিজেপি ◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ১৩

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া-রাহুলের আচরণ সন্দেহজনক ◻ হীরক কর ◻ ১৬

ড্রাগনের বিষে জর্জরিত শ্রীলঙ্কা ◻ চন্দ্রভানু ঘোষাল ◻ ২৩

চীনের ফাঁদে পা দিয়ে চোরাবালিতে পাকিস্তান ◻ সত্যপ্রকাশ ন্যায়মূর্তি ◻ ২৬

ভারতীয় সংগীত ইতিহাসের এক মহান পুরুষ দক্ষিণ ভারতের 'ত্যাগরাজ' ◻ দীপক খাঁ ◻ ৩১

নিবেদিতা চেয়েছিলেন ভারতের প্রতীক হোক বজ্র ◻ নিমাই কুমার মুখার্জি ◻ ৩৩

সারগাছিতে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্নপূর্ণারূপে অধিষ্ঠান ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ৩৫

অহিংস মহান ধারণা সন্দেহ নেই, কিন্তু স্বাধীনতার জন্য সহিংস পদ্ধতি আরও বেশি মহনীয় ◻ ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি ◻ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০ ◻ খেলা : ৩৮ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ চিত্রকথা : ৫০

ফঃ ১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১ আগস্ট ২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সিংহ কেন সিংহ হলো?

প্রকাশিত হবে ১ আগস্ট ২০২২

নতুন সংসদ ভবনে অশোক স্তম্ভের যে এমব্লেম বসানো হয়েছে, তাতে সিংহের ভাবভঙ্গী নিয়ে বিতর্ক শুরু করেছেন বিরোধীরা। তাঁদের বক্তব্য, আগেকার সিংহ ছিল 'অহিংস', কিন্তু মোদী সরকারের এই নতুন সিংহ বিপজ্জনক।

এরা সম্ভবত চিরকাল সার্কাসের সিংহ দেখেছেন। তাই জানেন না, স্বাধীন সিংহ সবসময়েই বিপজ্জনক। বিরোধীদের এই বিরোধিতা করার জন্যই বিরোধিতা, এটা মানুষের কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে উঠছে দিনে দিনে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় সিংহ কেন পালটে গেল? লিখবেন অনঙ্গদেব মিত্র, নিখিল চিত্রকর প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিশেষ ঘোষণা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ বাঙ্গলায় গত ১৯৩৯ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে। সেই কাজে বাঙ্গলা তথা ভারতের বহু কার্যকর্তা ও প্রচারকের পরিশ্রম নিহিত আছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রয়াত, অনেকে খুবই বৃদ্ধ। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাঙ্গলার সঙ্ঘকাজের প্রারম্ভিক ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন। এই কাজ স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট হাতে নিয়েছে। আগামী শুভ জন্মাষ্টমী, ২০২২ তিথিতে '**বাঙ্গলায় সঙ্ঘের কাজের ইতিহাস**' নামক এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে চলেছে। সহযোগ রাশি ২৫০্ টাকা। প্রকাশপূর্ব রাশি ১৫০্ টাকা।

ডাকযোগে বইটি নিতে হলে ডাক খরচ বাবদ ৫০্ টাকা অতিরিক্ত লাগবে।

প্রকাশ পূর্ব রাশি দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২২। জেলা অনুসারে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে টাকা পাঠাতে পারেন। সরাসরি টাকা ব্যাংকে পাঠানোর জন্য নীচে ব্যাংকের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো। টাকা ব্যাংকে পাঠানোর পর তপন সাহা (মো: ৯৯০৩০০২৯০১) অথবা মহেন্দ্র নারায়ণ দাস (মো : ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭)— এই দু'জনের কাউকে অবশ্যই জানাবেন।

বইটি কীভাবে সংগ্রহ করবেন তা লিখে জানাবেন। ডাকযোগে নিতে হলে অতিরিক্ত ৫০্ টাকা ডাকমাশুল পাঠাবেন।

Account Name : **SWASTIK PRAKASHAN TRUST**

A/C. No. : **0954000100121397**

IFS Code : **PUNB0095400**

Bank Name : **PUNJAB NATIONAL BANK**

VIVEKANAND ROAD

Kolkata - 700 006

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সিংহের থাবায় বিপর্যস্ত ড্রাগন

ভারতের প্রতিবেশী দেশ, কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত পর হইতেই চীনের আগ্রাসী মনোভাব প্রকট হইতে শুরু করে। কোনো পঞ্চশীল নীতি অথবা দশশীল নীতিই তাহার সেই মনোভাবের পরিবর্তন করিতে পারে নাই। লোক দেখানো চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার পরেও তাহারা ভারত আক্রমণ করিতে দ্বিধা করে নাই। ১৯৬২ সালে তাহারা ভারতভূখণ্ডের ৩৮ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা দখল করিয়া লইয়াছে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করিয়া বারবার ভারতভূখণ্ডে প্রবেশ করা তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক ও সামরিক সক্ষমতার নিরিখে তাহারা আরও আগ্রাসী হইয়া উঠিয়াছে। কখনো গালোয়ান, কখনো ডোকলাম, আবার কখনো অরুণাচল প্রদেশে নির্বিরোধে অনুপ্রবেশ করিয়া ভারতভূখণ্ড দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তথাগত বুদ্ধের অনুরূপ পঞ্চশীল নীতি অবলম্বন করিয়া ভারত শুধু একতরফা অহিংসার ললিতবাণী তাহাদের শুনাইয়াছে। তাহাতে তাহারা ভারতকে দুর্বল ভাবিয়া আরও বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে। নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে প্রথম তাহারা প্রত্যাঘাত পাইয়াছে। তাহাতে তাহারা বর্তমান ভারতের শক্তি কিঞ্চিৎ উপলব্ধিও করিতে পারিয়াছে। বিশ্ব দরবারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাহাদের আগ্রাসী রূপটি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ভারতকে বিব্রত করিবার জন্য ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিতেও প্রভাব বিস্তার করিবার খেলায় তাহারা মাতিয়াছে। শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে তাহারা শতভাগ সফল হইয়াছে। শ্রীলঙ্কা সরকারের দান খয়রাতির রাজনীতির ফলে তাহাদের রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। চীন এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছে। বৎসরের পর বৎসর চীন অলাভজনক নিঃশর্ত ঋণ প্রদান করিয়া শ্রীলঙ্কাকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। চীনা ড্রাগনের ফাঁসে পড়িয়া বর্তমানে শ্রীলঙ্কা সম্পূর্ণ দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে। ঋণের জন্য বর্তমান শতাব্দীর শুরু হইতেই চীনের উপর শ্রীলঙ্কার নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উন্নয়ন সহায়তার নামে ধীরে ধীরে দেশটিকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে চীনা ড্রাগন। বর্তমানে শ্রীলঙ্কার গুরুত্বপূর্ণ বন্দরটিও তাহাদের দখলে। শ্রীলঙ্কার উপর চীনের এই দখলদারি ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক অশনিসংকেত। ভারতের প্রতিবেশী এবং বেশ কয়েকটি ছোটো ও উন্নয়নশীল দেশের উল্লেখযোগ্য ঋণদাতা হইল চীন। নেপাল ও বাংলাদেশের মাধ্যমেও চীন ভারতকে বিব্রত করিতে চাহিতেছে। বিশ্ব রাজনৈতিক পর্যালোচকদের মতে পাকিস্তানকেও প্রায় গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে চীন। তাহাদের গোয়াদর বন্দর এই মুহূর্তে চীনের দখলে। চীনের উপর অতি নির্ভরতার বিপদ বুঝিতে পারিয়া পাকিস্তানের নাগরিকরা শঙ্কিত হইয়া তাহাদের সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে শামিলও হইয়াছেন। নেপালেও চীন রেল যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহারও উদ্দেশ্য ভারতকে চ্যালেঞ্জ জানানো। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরেও চীনের শ্যেনচক্ষু পড়িয়াছে। এই বন্দর দিয়াই তাহারা ভারতমহাসাগরে প্রবেশের পথ খুঁজিতেছে।

চীনের এই আগ্রাসী কার্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখিয়াছে ভারত সরকার। তাহাদের গাজোয়ারি অনুপ্রবেশ রুখিয়া দিতে সদাসতর্ক রহিয়াছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। চীনের সবচাইতে বড়ো বাজার হইল ভারত। সেই বাজার বন্ধ করিতে তাহাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক আমদানি-রপ্তানি বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। ইতিমধ্যে দুই দফায় ১৫০টিরও বেশি চীনা সফটওয়্যার অ্যাপ নিষিদ্ধ করিয়াছে কেন্দ্র সরকার। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে ইহা খুবই জরুরি পদক্ষেপ। সেই সঙ্গে দেশের জাগ্রত জনসমাজ চীনাপণ্য বয়কটের মনস্থ করিয়াছে। দেশের খুচরো ব্যবসায়ীগণ বৎসরে ৭৪০০ কোটি টাকার চীনা পণ্য আমদানি করিতেন। পাড়ার দোকান বৈদ্যুতিক পাখা হইতে শুরু করিয়া বাচ্চাদের খেলনা সব কিছুই চীনা পণ্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল। ব্যবসায়ীগণও এই আমদানি বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, মেক ইন ইন্ডিয়ার সিংহের থাবার আঘাতে চীনা ড্রাগন ভারতের খেলনা বাজার হইতে সম্পূর্ণরূপে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। ভারতকে দুর্বল করিবার ছক চীনের বহুদিনের। কিন্তু এখন দিন বদল হইয়াছে। ভারত সরকার যেমন তাহার সামরিক শক্তি ও কূটনীতির মাধ্যমে চীনের আগ্রাসী আচরণ দমন করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার সঙ্গে রাষ্ট্রভক্ত ভারতবাসী যদি সম্পূর্ণভাবে চীনা পণ্য বয়কট করিতে পারেন তাহা হইলে ভারতের প্রতি চীনের বিরূপ মনোভাবের চিরতরে পরিবর্তন ঘটিবে শুধু নয়, চীন এক বড়ো শিক্ষা লাভ করিবে।

সুভাষিতম্

দেশবংশজনৈকোঽপি কায়বাক্‌চেতসাং চয়ৈ।
যেন নোপকৃতঃ পুংসা তস্য জন্ম নিরর্থকম্।।

মানুষ যদি শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা অথবা এর যেকোনো একটির দ্বারা দেশ অথবা বংশের উপকার না করে, তবে এমন ব্যক্তির জন্মগ্রহণ করাই বৃথা।

ধনকড় বিদায়ে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো মমতার, তবে সামনে আরও বড়ো বিপদ

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

সামনেই (২১ জুলাই) তৃণমূলের শহিদ দিবস। ক্ষমতার তাপে 'শহিদ স্মরণে আপন মরণে রক্ত ঋণ শোধ কর'-র স্লোগান বাষ্প হয়ে গিয়েছে। এদিকে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের বিদায়ে আহ্লাদে আটখানা মমতা। সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সভার নামে যেন তোলাবাজি করা না হয়। মমতা আর অভিষেক জানেন তৃণমূল কোন খাদের দিকে গড়িয়ে চলেছে। তৃণমূল নেতারা ধনকড়কে প্রকাশ্যে 'পদ্মপাল' বলে ডাকতেন। সরানোর দাবি জানাতেন। দু' বছরের মাথায় আশা পূর্ণ হলো। ফেব্রুয়ারি মাসে লিখেছিলাম ধনকড়ের বিদায় আসন্ন। আগামী লোকসভা ভোট পর্যন্ত তিনি টিকবেন না। উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে ধনকড়ের নাম প্রস্তাব করেছে এনডিএ। রাজনৈতিক মহল বলছে মমতা বিরোধিতার পুরস্কার পেয়েছেন ধনকড়। ইঙ্গিতপূর্ণভাবে অনেকে বলছেন পুরস্কারটা কে পেল তা পরে বোঝা যাবে। তৃণমূলের এক সর্বভারতীয় নেতার কথায় 'পাপ বিদায় হলো'।

আমার আন্দাজ মমতার সামনে প্রশাসনিক টক্করের আরও বড়ো বিপদ ঘনিয়ে আসছে। এই মুহূর্তে মমতার একমাত্র চক্ষুশূল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কানাঘুঁষো চলছে তাঁর পিতা শিশির অধিকারী রাজ্যপাল হতে পারেন। সঙ্গে ঘোরা ফেরা করছে বিজেপির তাত্ত্বিক নেতা স্বপন দাশগুপ্তর নাম। তৃণমূল তাকে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না, কারণ বিধানসভা ভোটে হেরে যান স্বপনবাবু।

মমতাকে নিয়ে বিজেপির মূল সমস্যা বিজেপি কর্মীদের উপর তাঁর দলের হিংসা, আক্রমণ আর অত্যাচার। শিশিরবাবু তৃণমূলের টিকিটে সাংসদ। তিনি যে লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে মেদিনীপুরে সিপিএমের হিংসা আর অত্যাচার রুখে দিয়েছিলেন তা নিয়ে তিনি গর্ব করতে পারেন। সেই সময় তৃণমূলের প্রধান কাণ্ডারি আর মমতার সব চাইতে বিশ্বস্ত অভিভাবক ছিলেন শিশিরবাবু। মমতার ১৯৯৮-এ দল গঠন আর ২০১১-তে রাজ্যের ক্ষমতা দখলের আগে থেকেই মেদিনীপুর হয়ে উঠেছিল 'অধিকারী গড়' আর সিপিএমের একমাত্র ওয়াটারলু। মমতা কখনও ভাবেননি যে মেদিনীপুরের এই 'পিতা-পুত্রের' জোড় একদিন তার সবচেয়ে বড়ো মাথাব্যথার কারণ হবে। তাই মমতাকে প্যাঁচে ফেলতে রাজ্যপাল হিসেবে শিশিরবাবুকে তুলে ধরা হতে পারে। ১৯৯৯ সালে কয়েক মাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গের শেষ বাঙ্গালি রাজ্যপাল হয়েছিলেন শ্যামল সেন। তারপর আর কোনো বাঙ্গালি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হননি। তথাগত রায়কে মেঘালয় আর ত্রিপুরায় রাজ্যপাল করা হয়। জাতীয় স্তর থেকে রাজ্যপাল হিসেবে নরমপন্থী বিজেপি নেতা মুকতার আব্বাস নকভির নাম শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে শোনা যাচ্ছে কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানের নাম। একটি বিতর্ক সভায় যোগ দিতে কিছুদিন আগেই মুকতার কলকাতায় এসেছিলেন। আরিফ মহম্মদ খান ইসলামি ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনে পণ্ডিত আর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় তার মতো পারদর্শী মানুষ অল্পই আছেন। তাঁকে রাজ্যপাল করলেও মমতা ভালোরকম অস্বস্তিতে পড়তে পারেন। তাছাড়া তাঁকে দিয়ে সহজেই এক ঢিলে দু' পাখি মারা যাবে। এই দুই নেতার পাশাপাশি অনেকে জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল মনোজ সিন্হার কথা বলছেন।

> রাজনৈতিক মহল বলছে মমতা বিরোধিতার পুরস্কার পেয়েছেন ধনকড়। ইঙ্গিত পূর্ণভাবে অনেকে বলছেন পুরস্কারটা কে পেল তা পরে বোঝা যাবে।

আমার ধারণা রাজ্যের নতুন রাজ্যপাল কে হবেন বা হতে পারেন তার আন্দাজ মমতা হয়তো দিতে পারেন তাঁর দলের ২১ জুলাইয়ের সভায়। ততদিন গুজব চলবে। অনেকে অতিসরলীকরণ করে বলছেন 'যশবন্ত সিনহা-র নামও বলছেন যদি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন তিনি জিততে না পারেন। নির্বাচন লড়তে যশবন্ত তৃণমূলের জাতীয় নেতার পদ ছেড়ে দিয়েছেন। শিশিরবাবু রাজ্যপাল হলে মমতার বিরুদ্ধে বিজেপির লড়াই আরও তীব্র হবে, কারণ পুত্র শুভেন্দু মমতার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। সামনে তাই আরও বড়ো বিপদ মমতার। এক সময়ের অভিভাবকের সঙ্গে টক্কর নেওয়া বা ঘর করা যে খুব সহজ হবে না তা বিলক্ষণ জানেন মমতা। আবার অভিভাবককে সঙ্গে নিয়ে কীভাবে মসৃণ পথ চলা যায় তাও দেখাতে পারেন মমতা। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। ▯

তুমি কোন কাননের মুকুল

দলবদলেষু মুকুল রায়,

আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে আপনি ঠিক কোথায় থাকেন? কাঁচড়াপাড়া না সল্টলেক সেটা নিয়ে আমার আগ্রহ নেই। আমি জানতে চাই আপনি রাজনৈতিক ভাবে কোন বিশ্বাসে ভরসা রাখেন? কোন শিবিরে আছেন? আপনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিয়ে এসে বললেন তৃণমূলের প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন। আপনি বিজেপি বিধায়ক নন। যদিও সবাই জানে কৃষ্ণনগর উত্তর থেকে জীবনে প্রথম ভোটে জেতার সুযোগ আপনাকে বিজেপিই করে দিয়েছিল।

আপনি যখন তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসেছিলেন তখন আপনার দল 'গদ্দার' বলেছিল। কিন্তু আমি কিছু ভাবিনি। তৃণমূলের উপরে রাগ হয়েছিল। একটা মানুষ যদি তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস বদলায় তবে তাঁকে এমন গাল দেওয়া উচিত নয় বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু তার পরে আপনি খুব কিছু করে দেখাতে না পারলেও বিজেপি আপনাকে অনেক অনেক সম্মান দিয়েছে। সর্বভারতীয় দায়িত্ব থেকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সব দিয়েছে। রাজ্য দপ্তরে আপনার জন্য বড়ো অফিস ঘরও বানিয়ে দিয়েছিল। আপনি বিনিময়ে কী করেছেন বলতে পারবেন? একটা সময় আপনাকে প্রার্থী করে বিধানসভায় জিতিয়ে এনেছে বিজেপি। পরিকল্পনা ছিল বড়ো ভরসা করার। আপনার অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর। কিন্তু আপনি সেই সুযোগ হাতছাড়া করে ফেললেন। বিজেপির কতটা ক্ষতি হলো জানি না আপনার কী হলো বলুন তো? পিছনের দরজা দিয়ে আপনাকে বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ সে দায়িত্ব কিন্তু তৃণমূল আসলে আপনাকে দেয়নি। বিজেপির বিরোধিতা করার জন্য প্রধান বিরোধী দলের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য করেছিল।

এখন আপনি এক আঁধারের বাসিন্দা। যে ঠিকানায় কেউ যায় না। কেউ ঘিরে বসে থাকে না। কেউ 'মুকুল দা' বলে ডাকে না।

অত্যন্ত অসম্মানের সঙ্গে আপনি দায়িত্ব সামলেছেন ঘরে বসে। কারণ, বিধানসভায় আসার মতো মুখ ছিল না আপনার। বিধানসভায় আপনাকে কোথায় বসানো হবে সেটা নিয়েই তো চিন্তার শেষ নেই। কারণ, আপনি আসলে কারও নন। না শাসকের, না বিরোধীদের। শেষ পর্যন্ত আপনি পিএসি চেয়ারম্যান পদটাই ছেড়ে দিয়েছেন। ছেড়ে না দিয়ে উপায়ও ছিল কি? স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় যতই বলুন যে আপনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন এমন প্রমাণ নেই তা শুনে কিন্তু সাধারণ মানুষ হাসে।

সত্যি বলুন তো মুকুলবাবু, আপনাকে তৃণমূল যা যা দেবে বলেছিল তার কিছুই কি দিয়েছে? আপনার ছেলে শুভ্রাংশুর তো যুব তৃণমূলে পদ পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পাননি। আপনাকে কোনওদিন মন্ত্রীও বানাতে পারবে না তৃণমূল সরকার। আপনাকে সবচেয়ে বেশি যেটা দেওয়া যেত সেটা পিএসি-র চেয়ারম্যান। যদিও আপনাকে লুকিয়ে লুকিয়ে করতে হতো। সেটাও আপনি ছেড়ে দিয়েছেন।

তৃণমূলে ফেরার পরের দিকের একটা কথা মনে পড়ছে। কৃষ্ণনগরে গিয়ে বলেছিলেন, 'ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমি বলতে পারি, তৃণমূল পর্যুদস্ত হবে এবং এই কৃষ্ণনগরে স্বমহিমায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করবে বিজেপি। নিজের ক্ষমতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবে।' সেই সময় আপনার পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা একাধিকবার ভুল ধরিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও বিজেপির পক্ষ নিয়েই কথা বলেছেন আপনি। যদিও কিছুটা পরে ভুল শুধরে নেন। পরে বীরভূমেও একবার তৃণমূল ও বিজেপি একই বলে অসংলগ্ন মন্তব্য করেছিলেন।

কিন্তু আপনি এবার নিজের নতুন মত স্পষ্ট করে দিলেন। তৃণমূল আপনাকে মনে করে নিজের কিন্তু বলে বিজেপির। আর আপনি নিজেকে কী মনে করেন সেটা বোঝা দায়। আসলে আমার মনে হয় আপনার জীবনের সবচেয়ে সম্মানের দিনগুলো আপনি ভুলতে পারেন না। বিজেপিতে থাকার সময়টাই তো আপনার জীবনে সবচেয়ে সম্মানের ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সান্নিধ্য পেয়েছেন। বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডার সঙ্গে এক মঞ্চে বসার সুযোগ পেয়েছেন। প্রতিটি অনুষ্ঠানে আপনাকে সম্মানের সঙ্গে ডাকা হয়েছে। সামনের সারিতে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এখন আপনি এক আঁধারের বাসিন্দা। যে ঠিকানায় কেউ যায় না। কেউ ঘিরে বসে থাকে না। কেউ 'মুকুল দা' বলে ডাকে না। □

অতিথি কলম

স্বামীনাথন আইয়ার

পড়শি দেশ শ্রীলঙ্কার বিপর্যয় দেখে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ভারতের সজাগ থাকা দরকার

প্রথমে অর্থনীতি ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা যা প্রায় সাত-আট বছর আগে থেকেই শুরু হয় তারই চরম রাজনৈতিক বিপর্যয় আজ দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কায় ঘটে চলেছে। এমন সংকটজনক পরিস্থিতিতে বহু ছোটো ছোটো দেশই যা হয়, অর্থাৎ দেশের রাষ্ট্রপতি কোনোভাবে জনরোষ থেকে বাঁচতে দেশ ছেড়ে পালান, এখানেও তেমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। ভারতের সঙ্গে স্থল সীমানা না থাকলেও জলপথে শ্রীলঙ্কা ভারতের নিকট পড়শি তাই সেখানকার এত বড়ো উথাল-পাতাল পরিস্থিতি আমাদের ভাবাচ্ছে।

বিশেষ করে মারমুখী জনতার রাষ্ট্রপতির নিবাস দখল করা ও ভাঙচুর চালানোর যে ছবি নিয়ত টিভির পর্দায় ভেসে উঠছে তা ভীতিপ্রদ। গোতাবায়া রাজপক্ষের নাটকীয় দেশত্যাগ যথারীতি অর্থনৈতিক কপর্দকশূন্যতার দিকেই নির্দেশ করছে। রাষ্ট্রপ্রধানের রাষ্ট্র পরিচালনায় অর্থব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে রাখাই অন্যতম কর্তব্য। যে কারণে শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। প্রথম কথায় বেশ কয়েক বছর ধরে শ্রীলঙ্কার অতি উচ্চহারে রাজস্ব ঘাটতি। এই বিষয়টা অনেকে জানলেও একটু চট করে বলে নেওয়া যেতে পারে যে দেশের অভ্যন্তরে সরকার উন্নয়ন থেকে, সেবা, ভরতুকি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বেতন ইত্যাদি যাবতীয় খাতে যে খরচ করে তার থেকে সরকারের বিভিন্ন করখাতে যেমন আয়কর, বিক্রয় কর বিভিন্ন শুল্ক ইত্যাদি থেকে যে আয় হয় দুটির মধ্যে ফারাককেই রাজস্ব ঘাটতি বলা হয়। পৃথিবীর সব দেশেই যেহেতু উন্নয়নের কাজ থেমে থাকে না বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে রাজস্ব ঘাটতি হওয়াটা স্বাভাবিক। এর সঙ্গে চলতি খাতে ঘাটতিও ধরতে হবে। এটি হলো দেশের আমদানি ও রপ্তানি ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের জন্য আমদানি যদি রপ্তানি মূল্যের থেকে বেশি হয় তাহলেই চলতি খাতে ঘাটতি বাড়বে অর্থাৎ বিদেশি মুদ্রায় দেশকে আরও বেশি টাকা দিতে হবে। শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে শেষ কিছু বছর ধরে রাজস্ব খাতে ঘাটতি, অতিরিক্ত আমদানির (দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন প্রয়োজন মাফিক না হওয়া, যার কারণ রাজকোষে ঘাটতি) খেসারত মেটাতে বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার খালি হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এর ফলে বহু দেশকে আইএমএফ থেকে ঋণ নিতে হয়েছে। আজ তার সুদ মেটাবার ক্ষমতা সরকারের নেই। এর ফলে মানুষের পক্ষে প্রাণঘাতী মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। (১ লিটার পেট্রোল ৫০০ টাকা) জিনিসপত্রের বাজারে আকাল পড়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস নিতে আট দশ ঘণ্টা লাইন দিতে হচ্ছে। ভারতের এগুলির ওপর নজর রাখা প্রয়োজন।

কিছু কিছু উচ্চ ভাবধারার বিশ্লেষক এই অরাজকতার কারণ জাতিগত টেনশন বলে চালাবার চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ সিংহলীরা তামিল ও মুসলমানদের দেশ থেকে নিকেশ করার নীতির কারণেই এই সর্বনাশ। বাস্তবে শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বিষয় এটাই দেখা গেল যে কয়েক দশক ধরে মোটামুটি গ্রহণীয় মাত্রার ৫ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধি রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ চলাকালীনও থেমে থাকেনি। তামিল বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা ও পঞ্চাশ হাজার নাগরিককে হত্যা করার পরও দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্ট অস্থির পরিস্থিতিতে মলম দেওয়ার কোনো ব্যবস্থাই রাজাপক্ষ সরকার করেনি। তবুও এটা সত্যি যে ২০১০ থেকে ১২ অবধি শ্রীলঙ্কা ৮৫ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির হার ধরে রেখেছিল। সূত্র মারফত জানা গেছে, শ্রীলঙ্কার বহু মানুষ মনে করে যে রাজাপক্ষ ও তার পরিবার দেশের সম্পদ লুট করে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। বাস্তবে বিরাট বড়ো ধরনের কোনো সম্পদ আত্মসাতের কোনো প্রমাণ নেই। এছাড়া মধ্য আয়ের কোনো দেশে রাজনীতিবিদরা কিছু বিলিয়ন ডলার চুরি করলেও দেশের সামগ্রিক পতন হয় না।

অনেকে আবার বিশ্বাস করেন এর জন্য দায়ী চীনের থেকে নেওয়া শ্রীলঙ্কার বিপুল ঋণ। চীন শ্রীলঙ্কাকে ঋণ শোধের জালে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। তাদের ঋণ শোধ করার টাকা নেই। চীনের দেওয়া ঋণের পরিমাণ ১৫ শতাংশ যাকে কখনোই বিশাল পতনের কারণ বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চীন রাজপক্ষের নির্বাচনীক্ষেত্র 'হামবানতোতায়' এক অতিকায় বন্দর নির্মাণ করতে বহু বিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়। কিন্তু ঋণ যাতে এখুনি শোধ করতে না হয় তার জন্য চীন বন্দরটি লিজ নিয়ে নেয়। তাহলে ঋণ খেলাপি হওয়ার বিষয়টি অন্তত এক্ষেত্রে ঠিক নয়। চীন কিন্তু বহু উন্নয়নশীল দেশকে ব্যাপক হারে ঋণ দিয়ে গেছে তাদের ঋণ শোধের ক্ষমতা না দেখেই (অনেকটাই রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের কারণে একথা সত্যি)। এক্ষেত্রে উদাহরণ জাম্বিয়া যারা আদৌ ঋণ শোধ করতে পারছে না। রাজপক্ষকে তুষ্ট করতে বড়ো আকারের ঋণ দিয়ে আবার টাকা খোয়াতে চীন যে তৈরি নয় তা আজকের শ্রীলঙ্কাকে দেখলেই বোঝা যায়। যদিও চীনের ওপর এই দায় আনা হচ্ছে। এর চেয়ে মূল অর্থনৈতিক কারণগুলোর ওপর নজর করলে ভারতের অনেক কাজে আসবে। শ্রীলঙ্কায় দীর্ঘকাল ধরেই যে কর আদায় করা হয় অর্থাৎ রাজকোষে যে অর্থ আসে তার পরিমাণ খুব ভালো অর্থনৈতিক উন্নয়নের বছরগুলিতে টেনেটুনে ১০ শতাংশ। এর

বিপরীতে কিন্তু ধরতে হবে ঢালাও অনুদান ও জনপ্রিয় ভোটজোগাড়ি মুফতে দেওয়া উপহারজনিত ব্যয়। এরই ফলশ্রুতিতে যে ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা অর্থনীতিতে ঘনীভূত হচ্ছিল এখন তারই বিস্ফোরণ ঘটছে। কিছুকাল আগেও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ)-এর কাছে এই অর্থাভাব মেটাতে ঋণ করতে হয়েছিল। ২০১৬ সালে আইএমএফ- এর সঙ্গে যে ঋণচুক্তি হয় যার বিশালাকারের জন্য জিডিপি-র সঙ্গে রাজস্ব ঘাটতির হার ৬.৫ শতাংশে নেমে আসে। রাজস্ব ঘাটতি কিন্তু সাধারণত ঋণ নিয়ে কমাবার রীতি নয়। অভ্যন্তরীণ আয় বাড়ানোই বিধেয়। সেই কারণে এই ঋণ একটি জনপ্রিয়তাকাঙ্ক্ষী রাষ্ট্রের পক্ষে বড়ো বোঝা।

তবু এই ধার দিয়ে রাজস্ব পরিস্থিতি শোধরাবার একটা ইতিবাচক চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এর পরই ২০১৮ সালে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হয়। ২০১৯ ও ২০২০ সালে পরপর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এখানেই সেই দেশকে নিঃস্ব করার চালাকিভরা নির্বোধ কৌশলটি লুকিয়ে রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কর ছাড় দেওয়ার তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কর কমানোর ফলে এক ধাক্কায় ১০ লক্ষ করদাতা করের আওতার বাইরে চলে যান। ভ্যাটের পরিমাণ ১৫ থেকে ৮ শতাংশে নামিয়ে দেওয়া হয়। অন্যান্য আরও বেশ কিছু কর হার ব্যাপক ভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়। ভয়ংকর ফলাফল হাতেনাতে মেলে। দেশের লাইফ লাইন রাজস্ব খাতে ঘাটতি জিডিপির সঙ্গে শতাংশে ২০২০ সালে ১১ ও ২০২১ সালে ১২ শতাংশে পৌঁছয়। দেশের দেউলিয়া তো হওয়ারই ছিল।

এই সূত্রে ভারতের কাছে শিক্ষণীয় বিষয় অতি পরিষ্কার। বিশ্বব্যাপী একটি মন্দার আশঙ্কা এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির বিশ্ব বাজারে সমস্যা ও জট তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় ভারতকে এই মুহূর্তেই রাজস্ব ক্ষেত্রে কঠিন নীতি তথা পরিকল্পনা নিতেই হবে। বাজেটে উল্লেখিত রাজস্ব ঘাটতিকে বছর বছর ০.৫ শতাংশ করে কমিয়ে আনার ঘোষণা পরিস্থিতি অনুযায়ী পর্যাপ্ত নয়, এটা আরও বাড়াতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ২০২৪ সালের দেশের সাধারণ নির্বাচন ক্রমশ এগিয়ে আসবে। যত নির্বাচন এগোবে ততই নিখরচায় কিছু দেওয়ার টোপ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুদানের বন্যা বইয়ে দেওয়ার সুযোগ বাড়বে। তৃতীয়ত, একটা টেকনিক্যাল বিষয় কিন্তু সকলের জানা জরুরি। শ্রীলঙ্কার মতোই আয়ের দেশ হওয়ায় ভারতও আইএমএফ থেকে কনসেশন বা কম হারে সুদ পাওয়ার অধিকারী নয়। বাধ্য হয়ে বাণিজ্যিক হারেই এখান থেকে ঋণ নিতে হয়। যার পরিণতি হয় ধ্বংসাত্মক। শ্রীলঙ্কায় এটাই হয়েছে। তাই এই বাণিজ্যিক হারের সুদ এবং বাণিজ্যিক ঋণ ভারতের পক্ষেও অশনি সংকেত।

চতুর্থত, শ্রীলঙ্কা একই সঙ্গে তীব্র রাজস্ব ও চলতি খাতে ঘাটতির ধ্রুপদী দৃষ্টান্ত। এরই ফলে অতি উচ্চ হারের মুদ্রাস্ফীতি ও দেউলিয়া অবস্থা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। ভারতের কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্যগুলি মিলিয়ে কমবেশি ১১ শতাংশ রাজস্ব খাতে ঘাটতি রয়েছে (রাজ্যে রাজ্যে লাগামছাড়া রাজস্ব ঘাটতির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সামনের সারিতে, লেখকের বক্তব্য নয়)। অন্যদিকে চলতি খাতে (আমদানি রপ্তানি) ঘাটতি এ বছর জিডিপির সঙ্গে তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে ৩ শতাংশে পৌঁছবে। বর্তমানে ভোগ্যপণ্যের খুচরো মুদ্রাস্ফীতি এবং পাইকারী মুদ্রাস্ফীতি ১৫ শতাংশ ঘোরাঘুরি করছে। এখন বড়ো কোনো সমস্যা নিশ্চয় নেই। কিন্তু চোরা চাপ অনুভব করা যায়। তাই কোমর বেঁধে লড়াই-উপযুক্ত থাকতে হবে।

ক্রমবর্ধমান রাজস্ব খাতে ঘাটতি শ্রীলঙ্কার ঋণ— জিডিপির অনুপাত ২০১৬ সালে ৭৬ শতাংশ থেকে আজকের বিপর্যয়ের সময় ১১৭-তে পৌঁছেছে। কোভিডের আক্রমণের জন্য আমাদের বিরাট দেশে এটা কিছুটা বেড়ে এখন ৯০ শতাংশ। সরকারকে এই হার কমিয়ে আনার জন্য তৎপর হতে হবে।

ভারত অবশ্যই অন্য বহু দেশের চেয়ে বিশ্ব বাজারগুলিতে ঘনিয়ে আসা সমস্যার মোকাবিলায় অনেক বেশি সক্ষম। কিন্তু পরিতৃপ্তির কোনো জায়গা নেই। কোভিডে সঙ্কোচন আসার পর থেকে অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে একটা জোয়ার আনার প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে। কিন্তু টাকার জোগান দিতে অনিয়মিত ঋণের জাল এড়িয়ে চলতে হবে। ভারতে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারের বিপুল পরিমাণই ভারতের অন্তর্নিহিত শক্তি। তাকে অক্ষত রাখতেই হবে।

(লেখক অর্থনীতিবিদ এবং সাংবাদিক)

শোকসংবাদ

মালদা জেলার গাজোলের স্বয়ংসেবক তথা সংস্কার ভারতীর কার্যকর্তা সুকুমার বালোর পিতৃদেব সুশীল বালো গত ১৮ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি বাংলাদেশে সংগীত শিক্ষক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

* * *

বর্ধমান নগরের শ্রীকৃষ্ণ প্রভাত শাখার স্বয়ংসেবক স্বপন কুমার দে'র জ্যেষ্ঠ ভগিনী ছবি রানি দে গত ১৫ জুলাই পরলোকগমন করেন।

পাত্র চাই

কলকাতা সল্টলেক নিবাসী WB ব্রাহ্মণ চট্টোপাধ্যায় কাশ্যপ গোত্র পেনশনভোগী অধ্যাপকদ্বয়ের অবিবাহিত সুশ্রী একমাত্র কন্যা প্রায় 40/5' বহুজাতিক সংস্থায় উচ্চপদে চেন্নাইতে কর্মরত বার্ষিক 24^{+}L, জন্ম 03/09/1982, সময় 15.32, স্থান কলকাতা, মকরলগ্ন, কুম্ভরাশি, শতভিষা নক্ষত্র, দেবারিগণ, B Pharm, PGADBM, আমিষ ও নিরামিষ খাদ্যে অভ্যস্ত, এবং শাড়ির তুলনায় ফর্ম্যাল বিদেশি পোশাকে বেশি স্বচ্ছন্দ। বিবাহ পরবর্তী পর্বেও কন্যা চাকরি করবে। অবিবাহিত ব্রাহ্মণ স্বদেশে বা বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত, আয় ও শিক্ষায় কন্যার সমতুল পাত্র চাই।
যোগাযোগ : anis.saltlake@gmail.com
Mob. : 9830513598

জেহাদি সন্ত্রাস প্রতিহত করতে জোটবদ্ধ হিন্দু সঙ্ঘ গড়ে তোলা আশু প্রয়োজন

বরুণ মণ্ডল

আবার জ্বলছে বাংলাদেশের নড়াইলের হিন্দুদের বাড়িঘর। ভিটে মাটি লোকলস্কর পুড়ে ছারখার। হেলদোল নেই প্রশাসন কিংবা বিশ্বের কোনো মানুষের। জেনে বুঝেও ঘাপটি মেরে রয়েছে ভারতীয় মিডিয়াগুলি। যদি ধর্মীয় সুড়সুড়ি দেওয়ার অভিযোগে মোটা টাকার বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে যায়! চুপচাপ রয়েছে শান্তশিষ্ট হিন্দুগুলি। যদি ফ্রি খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়! আর আমার মতো বোকা ইউটিউবার যাদের নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো অভ্যাস, তারাই প্রতিবাদ দেওয়া শুরু করুক। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বা ফেসবুক পেজটা ফলো করে সঙ্গে থাকুন। 'ধর্ম-বিজ্ঞানের তফাৎ বুঝিয়ে কেন জেলে যাবেন শিক্ষক?' বাংলাদেশি শিক্ষক হৃদয় মণ্ডলের হেনস্থার ঘটনায় কিছুটা সরব হয়েছেন লেখিকা তসলিমা নাসরিন। এই কিছুদিন আগে কপালে টিপ পরা নিয়ে এক কলেজ শিক্ষিকাকে হেনস্থার অভিযোগ উঠেছিল নাজমুল তারেক নামে এক পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে। বড়োই মজা এবং আক্ষেপের বিষয় সবক্ষেত্রেই ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগ!

বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার বিনোদপুর রামকুমার উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের শিক্ষক হৃদয় মণ্ডলের বিরুদ্ধে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানার অভিযোগ উঠেছে। বিজ্ঞানের শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে বিজ্ঞান আর ধর্ম দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। একটি প্রমাণ নির্ভর আরেকটি বিশ্বাস নির্ভর। তাঁর সেই বক্তব্যের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। অভিযোগ, এরপর থেকেই ধর্ম অবমাননার দায়ে বিদ্ধ ওই শিক্ষক। কথা হলো বাংলাদেশে এসব হচ্ছেটা কি? শেখ হাসিনা পরিচালিত বাংলাদেশ সরকারের ধর্মনিরপেক্ষতার এই কি নমুনা? ধর্মীয় অত্যাচারে বা অন্য কোনো কারণে বাংলাদেশ আজ প্রায় হিন্দু শূন্য... বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে বিষয়ে কেন ওয়াকিবহাল নন?

গত বছর দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে বাংলাদেশে অবস্থিত আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে ইসলামিক মৌলবাদীরা নৃশংস আঘাত হানল, নিরীহ ব্রহ্মচারীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালালো। এমন হাজার হাজার ঘটনার কেন সুবিচার দেবেন না ধর্মনিরপেক্ষ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা? এই কিছুদিন আগেও ইসকন মন্দিরে পুনরায় আক্রমণ করেছে ইসলামি মোল্লাবাদীরা; তবু পূর্বের মতো শেখ হাসিনা নীরবতা বজায় রেখেছেন।

মোল্লাবাদীদের অনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে চোখের সামনে আফগানিস্তানকে ধ্বংস হতে দেখলাম, একইভাবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের আজ চরম অস্তিত্ব সংকট। নির্বাচনে জয়লাভ এবং ক্ষমতা ভোগের লালসায় শেখ হাসিনা ইমরানের পথেই হাঁটছেন কি? যদি তাই হয়, তবে কিন্তু তার পরিস্থিতিও ইমরানের মতোই হবে।

পাশাপাশি আরব দেশগুলিতে, ইন্দোনেশিয়া অথবা প্রতিবেশী দেশ চীনের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায় তারা কেউই কিন্তু মোল্লাবাদীদের কাছে মাথা নত করেনি। উক্ত দেশগুলি রাষ্ট্র এবং দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য যে কোনো নীতি এবং আইন বাস্তবায়ন করেছে। ধর্মীয় ভাবাবেগের মূল্য উক্ত দেশগুলিতে নেহাতই নগণ্য। ফলে তাদের উন্নতি আজও ঊর্ধ্বগতি। জঙ্গিপনা এবং আত্মঘাতী হামলার ঘটনা সে সমস্ত দেশে ঘটে না বললেই চলে। ভোটের নিরিখে মোল্লাবাদীদের যতই তোল্লাই দেওয়া হোক না কেন, তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হলেই 'মানবতাবিরোধী' প্রকৃত রূপ বেরিয়ে আসবেই।

ধর্মব্যবসায়ী ইসলামিক ধর্মগুরু ওয়াজের নামে ধর্মীয় ঘৃণা (বিশেষভাবে হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে) যেভাবে বাংলাদেশের মাঠে ময়দানে মাইক বেঁধে তারস্বরে প্রচার করেন; অথচ বাংলাদেশী প্রশাসন নির্বিকার চিত্তে সেগুলি মেনে নিচ্ছে। তা থেকে প্রমাণ হয় শেখ হাসিনা সরকার যতই ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়ান না কেন,ক্ষমতায় টিকে থাকতে তার শেষ আশ্রয় ইসলামি মোল্লাবাদ। মুজিব কন্যা তথা আওয়ামী লীগ সুপ্রিমো শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির নেত্রী খালেদা জিয়ার মধ্যে মানসিকতার কোনো প্রাথমিক তফাৎ নেই। বলিহারি সমগ্র বিশ্ব! সারা বিশ্বে নাকি আজ প্রচুর শিক্ষিত রয়েছে। অথচ সমগ্র বিশ্বের মানুষের মধ্যে মাত্র কয়েক শতাংশ ইসলামিক মৌলবাদীরা সমগ্র বিশ্বের কাছে আতঙ্কস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রতিনিয়ত তারা নির্মমভাবে গণহত্যা করে চলেছে। বিশ্ব চোখ মেলে দেখছে। জাতি ধর্ম ভাষা বর্ণ বাদ দিয়ে এই মৌলবাদের বিরুদ্ধে কেন রুখে দাঁড়ানো হবে না? এ প্রশ্ন সমগ্র বিশ্বের কাছে এই ভিডিয়ো আলোচনার মাধ্যমে রাখছি। বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশে বিভিন্ন নামে এত ইসলামপন্থী জঙ্গি সংগঠন রয়েছে। সেই সমস্ত ধর্মান্ধ উন্মত্ত জনতার কাছে এই সাজানো গোছানো পৃথিবীর সুখ শান্তি নষ্ট হতে বসেছে, তার প্রতিবাদ কেন শুরু হবে না এক জোটে বা সমস্বরে? আন্তর্জাতিক স্তরে এই সমস্যা নিয়ে কেন আলোচনা শুরু হবে না? বিভিন্ন রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক রাষ্ট্রজোট রয়েছে, সমগ্র রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রসঙ্ঘ রয়েছে, তবে এই মোল্লাবাদের বিরুদ্ধে কেন জোটবদ্ধ সঙ্ঘ থাকবে না। ইসলামিক মোল্লাবাদীদের করাল গ্রাস থেকে পৃথিবী কীভাবে রক্ষা পাবে? □

বান্দার মুখে ঘাতকের মুখোশ

অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

খাদিম ফারসি শব্দ। অর্থ আল্লাহ্‌র সেবক। ইসলামি আমলে ভারতে সুফিবাদের রমরমার যুগে মুসলমান সমাজে এই খাদিম শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। ইদগা এবং দরগায় এরা থাকতেন এবং মূলত ইসলামের প্রচার করতেন। ইসলামি লেখাজোখায় খাদিমদের উদ্দেশ্য এরকম সরল করে দেখানো হলেও সুফি বা খাদিমদের যে গুপ্তচরের কাজে লাগানো হতো তার প্রমাণ আমাদের ইতিহাসে আছে। ইসলামি আমল শেষ হয়েছে কিন্তু সেই ট্র্যাডিশন এখনও রয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র বান্দারা এখন ইসলামিক স্টেটের নেশায় মত্ত হয়ে সাধারণ মুসলমানকে খেপানোর জন্য প্ররোচনামূলক ভাষণ দেন, হিন্দু দেবদেবীদের নিয়ে রঙ্গ-রসিকতা করেন— এমনকী নূপুর শর্মাকে খুন করার জন্য সুপারিও দেন।

আজমেড় শরিফের নাম সকলেই জানেন। মইনুদ্দিন চিস্তি সাহেবের বিখ্যাত দরগা আছে এখানে। সারা বছর মুসলমানদের সঙ্গে অংসখ্য হিন্দুও এখানে চাদর চড়াতে আসেন। তাতে এখানকার ছোটো-বড়ো দোকানদার এবং হোটেল মালিকদের ভালো ব্যবসা হয়। এই ব্যবসার পরিমাণ বেসরকারি মতে প্রায় ৩৪০০ কোটি টাকা। এই আজমেড় শরিফেই ঘটেছে একের পর এক কাণ্ড। প্রথমে সলমন চিস্তির কথায় আসা যাক। তিনি আজমেড় শরিফের খাদিম। জুলাইয়ের গোড়ায় তার একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলো। তাতে দেখা গেল তিনি বলছেন, 'নূপুর শর্মাকে যে গলা কেটে খুন করবে তাকে আমি আমার বাড়ি দিয়ে দেব।' অর্থাৎ সুপারি দেওয়া হয়ে গেল। এরপর বান্দাদের ভেতর থেকে কেউ এসে কাজটা করে দিলেই কেল্লা ফতে! খাদিমের বাড়ি তো পাওয়া যাবেই, উপরি হিসেবে ইন্তেকালের পর জন্নতে বাহাত্তর হুরের সেবাযত্নও পাওয়া যাবে। সলমন চিস্তি শুধুমাত্র খাদিম নন, উচ্চশ্রেণীর অভিনেতাও বটে। যেভাবে কেঁদে কেঁদে কথাগুলো বলছিলেন তাতে অতি বড়ো পাষণ্ডের চোখেও জল আসার কথা। কিন্তু হলো ঠিক উলটো। ভিডিয়োটি ভাইরাল হবার পর সারা দেশ ক্ষোভে ফেটে পড়ল। এর কিছুদিন আগে রাজস্থানের দর্জি কানহাইয়ালাল ও অমরাবতীর এক কেমিস্টকে নূপুর শর্মাকে সমর্থন করার 'অপরাধে' খুন করেছে বান্দারা। ফলে তুষের আগুন জ্বলছিলই। সলমন চিস্তির কান্নাকাটি তাতে ঘি ঢেলে দিল।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট কংগ্রেসি কালচারে আস্থা রাখেন। গুরুপাক আহারের ফলে বদহজম হলেও নরেন্দ্র মোদীকে দোষ দেন। তাতে ১০, জনপথ রোডে নম্বর বাড়ে। কানহাইয়ালাল কাণ্ডের পর তিনি যথারীতি বিজেপিকে দোষ দিয়েছিলেন। সলমন চিস্তির ভিডিয়ো ভাইরাল হবার পর দেশ যখন ফুঁসছে তখনও তাঁর পুলিশ সলমন চিস্তির বাড়িতে গিয়ে তাকে খুঁজে পেল না। অথচ এর দু'দিন পর বাড়িতেই পাওয়া গেল সলমন চিস্তিকে। সারা দেশ দেখল রাজস্থান সরকারের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নাটক। সলমন চিস্তিকে গ্রেপ্তার করার দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করার জন্য সেদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ইলেকট্রনিক চ্যানেলের সাংবাদিকেরা। তাদের ক্যামেরায় ধরা পড়ল রাজস্থান পুলিশের সার্কাস! এক পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেদিন ভিডিয়োটা কি নেশা-ভাং করে করেছিলেন?' সলমন চিস্তি সাচ্চা মুসলমান, বললেন, 'আমি নেশা করি না।' ঠিক সেই সময় পিছন থেকে এগিয়ে এলেন আরেক পুলিশ অফিসার, বললেন, 'বল নেশা করেছিলি। তাতে তোকে বাঁচাতে আমাদের সুবিধে হবে।'

> **ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য কংগ্রেস জনজাতি ও মুসলমানদের ব্যবহার করেছে। কংগ্রেসের ফর্মূলায় বান্দা হয়ে গেছে ঘাতক। আজমেড় শরিফের মতো তীর্থক্ষেত্রও রূপান্তরিত হয়েছে সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘরে।**

তেইশে রাজস্থানে বিধানসভা নির্বাচন। ভোটের মুখে রাজস্থানের কংগ্রেস সরকার সলমন চিস্তিদের শাস্তি দিতে কতটা তৎপর হবে সেটা এই ঘটনা থেকেই পরিষ্কার। যদিও সলমন চিস্তি দাবার বোড়ে মাত্র। আঞ্জুমান কমিটি অব দরগা অব খাজা মইনুদ্দিন চিস্তির সচিব সৈয়দ সরওয়ার চিস্তিও রয়েছেন নূপুর শর্মা বিতর্কের ঘোলাজলে মাছ ধরাদের তালিকায়। 'চিস্তি' পদবি নিয়ে তিনি আজও গর্বিত। কারণ চিস্তি পদবির সঙ্গে জড়িয়ে আছে মুঘলদের ডিএনএ। সৈয়দ সাহেব প্রকাশ্যে বলেন, 'হাম আটশো সাল হিন্দুস্থান মে হুকুমত কি হ্যায়। হাম পর ছোড় দো, হাম সব কুছ সামহাল লেঙ্গে।' এই কথায় হাততালির লহর ওঠে। তারপর ঝেড়ে কাশেন সৈয়দসাহেব। নূপুর শর্মার বিবৃতি যে

ফঃ ২

ভারতে ইসলামকে বিপন্ন করার চেষ্টা সেটা বলতে গিয়ে আগুন উগরে দেন। পরোক্ষে মুসলমান জনতাকে জিহাদে নামার প্ররোচনা দেন। আজমেড়ের পুলিশ চৌকি দরগা থেকে বেশি দূরে নয়। তারা এই প্ররোচনামূলক ভাষণের নাড়িনক্ষত্র জানেন কিন্তু মুখে রা কাড়েন না। সম্প্রতি পাকিস্তানের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকটিভিস্ট আসিফ জাকারিয়ার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। তাতে তিনি তথ্যপ্রমাণ-সহ দেখিয়েছেন আজমেড় শরিফের পাকিস্তান-যোগ। তাতেও রাজস্থান পুলিশের মতিগতি ফেরেনি।

সৈয়দ সরওয়ার চিস্তির ছেলে আদিল চিস্তি। নূপুর শর্মার বক্তব্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি গণেশের হাতির মুখ নিয়ে মশকরা করেছেন। তার প্রশ্ন, একজন দেবতার শরীর মানুষের কিন্তু মাথা হাতির হয় কী করে? তিনি প্রশ্ন করেছেন হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবতা নিয়েও। বিষ্ণুর দশ অবতারের বামন, বরাহ ও কূর্ম অবতার নিয়ে বলার সময় তিনি ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা বিদ্রূপের হাসিটি লুকোতে চাননি। একটা কথা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সৈয়দসাহেব বা সলমন চিস্তির মতো তিনি জিহাদের প্রেসক্রিপশন দেননি, বরং তার পছন্দ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। অনেকটা বামপন্থীদের ঢঙে। তার জন্য তিনি হিন্দুদের বইপত্তর পড়েছেন। হজম হয়নি, সেটা অন্য কথা। কোটি মানে যে সংখ্যা নয়, রকম— তা তার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। গণেশের হাতির মাথাও যে রূপকার্থে ব্যবহৃত, সেটাও তার পক্ষে বোঝা কঠিন আর দশাবতারের তত্ত্ব তো আরও জটিল। আসলে এসব বুঝতে হলে সতেরো হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা প্রয়োজন। হাজার সার দিলেও আরবের মরুভূমিতে এসব জন্মাবে না। আদিল চিস্তি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন কিনা বলা মুশকিল, তবে ক্ষমা চেয়েছেন। বেশ সিরিয়াস মুখ করে বলেছেন, 'আমার কথায় হিন্দু ভাইয়েরা যদি দুঃখ পেয়ে থাকেন তা হলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমি নূপুর শর্মার কথার প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলাম, কাউকে দুঃখ দিতে চাইনি।'

ভালো কথা। কিন্তু এই ক্ষমা প্রার্থনা কি শুধু হিন্দু ভাইদের মনোকষ্টের কথা ভেবে নাকি পেটে টান পড়ার আশঙ্কায়? এ কথা উঠছে তার কারণ আজমেড় শরিফের কর্তারা গরম গরম বুলি আউড়ানো শুরু করতেই একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। এর জন্য অবশ্য সতি-সত্যি নরেন্দ্র মোদী দায়ী। তিনি ক্ষমতায় আসার পর সারা বিশ্বে ভারতের ডঙ্কা বাজতে দেখে হিন্দুরা আর ঘুমন্ত অজগর নেই। হাম ভি কুছ কম নেহী— গোছের একটা একরোখা মনোভাব ফিরে এসেছে তাদের মধ্যে। অবশ্যই এই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ পড়ে না, বা বাঙ্গালিরা আসেন না। এখানকার ঘুম ভাঙতে এখনও ঢের দেরি। কিন্তু ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ছবিটা এমন পোকায় কাটা নয়। সেখানে অন্যায় দেখলে আজকাল প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে। আজমেড়েও উঠেছে। চিস্তিদের ভোকাল টনিক দেওয়া শুরু হবার পর থেকে আজমেড়ে দরগা দর্শন যাত্রীদের (জাহারিন) সংখ্যা ৯০ শতাংশ কমে গেছে। প্রচুর মানুষ হোটেলের বুকিং বাতিল করেছেন। দোকানদারদের প্রায় মাছি তাড়ানোর অবস্থা। অন্যান্য ছোটো ব্যবসায়ীরাও উপার্জন হারিয়ে রীতিমতো কোণঠাসা। একটা করে দিন যাচ্ছে আর চিস্তিদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিষোদ্গার বাড়ছে। চাপে পড়ে গেছেন আজমেড় শরিফের বিধাতারা। সেই জন্যেই ক্ষমা চেয়েছেন আদিল চিস্তি। কারণ বাইরে থেকে পাকিস্তান যতই উসকানি দিক, জিহাদ নিয়ে বেশি মাতামাতি করলে শ্যাম ও কুল দুইই যাবে। শেষে হয়তো মুঘল সলতনতের কোহিনুরদের জেলের ঘানি টানতে হবে। অতএব, রক্ষা করো রঘুবীর!

তারেখ ফতেহ্ সারা বিশ্বের মুসলমানদের অবস্থা প্রসঙ্গে বলার সময় একটা কথা প্রায়ই বলেন, they are not capable of rational thinking। যারা এই কথা ওর মুখে শুনেছেন তারা নিশ্চয়ই এর ঠিক পরেই ওর মুচকি হাসিটাও লক্ষ্য করেছেন। এই বাঁকা হাসির তিরটি সম্ভবত ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিবিদদের জন্য। কারণ তাঁরা চান না মুসলমানরা যুক্তিসঙ্গত চিন্তাভাবনা করুন। মুসলমানরা ভাবতে শিখলে অন্তত তাদের একাংশ যারা মোল্লা-মৌলবিদের কথায় পাথরটাথর ছোড়ে, তাদের মনে এইসব রাজনৈতিক নেতা ও ধর্মগুরুদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। তারা নিশ্চয় ভাববে, পাথর যে ছোড়ে সে জেলে যায়। নয়তো পুলিশের গুলি খেয়ে মরে। কিন্তু ওইসব নেতা আর মোল্লারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ক্ষমতা ভোগ করে। নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যেই ওরা হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব টিকিয়ে রাখে। জল, হাওয়া, সার দিয়ে ইন্ধন জোগায়। সব কিছুই আসলে রাজনীতির জন্য।

নরেন্দ্র মোদী যথার্থই বলেছেন যে স্রেফ ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য কংগ্রেস জনজাতি ও মুসলমানদের ব্যবহার করেছে। কংগ্রেসের ফর্মূলায় বান্দা হয়ে গেছে ঘাতক। আজমেড় শরিফের মতো তীর্থক্ষেত্রও রূপান্তরিত হয়েছে সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘরে। □

With Best
Compliments from -

A
Well Wisher

চব্বিশে কী হতে পারে তার ইঙ্গিত বাইশেই দিচ্ছে বিজেপি

দুর্গাপদ ঘোষ

উত্তরপ্রদেশের দুই আজমগড়েই কেল্লাফতে করল বিজেপি। ত্রিপুরায় ৪ আসনেই মমতা বাহিনীর চার প্রার্থীর জমানত বাজেয়াপ্ত! পঞ্জাবে আম আদমি পার্টির হাতছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর ছেড়ে আসা সাঙ্গরুর লোকসভা আসন। 'এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা!' বলতে গেলে শিলাই বটে। উল্লেখিত সবকটা উপনির্বাচনেই পরাজিত প্রার্থীদের দল এবং নেতারা রাজনীতির ঘোলা জলে সত্যি-সত্যিই ভারী ভারী পাথরের মতো। কিন্তু গত ২৬ জুন ফলাফলে দেখা গেল নেতাদের সব দাপটই ফুলের ঘায়ে মূর্ছা গেছে বিশেষ করে পাশের রাজ্য ত্রিপুরায় এবং দেশের বৃহত্তম রাজ্য উত্তরপ্রদেশে। দিল্লির রাজেন্দ্রনগর বিধানসভা আসনটা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল কোনোমতে ধরে রাখতে পারলেও সাঙ্গরুর লোকসভা আসন অকালি দল (অমৃতসর) সভাপতি সিমরণজিৎ সিংহ মান কেড়ে নেওয়ার ফলে লোকসভায় আপের অস্তিত্ব রইল না বলা চলে। ১৯৯৯ সালের পর প্রায় ২৩ বছর বাদে আসনটি ফের সিমরণজিতের দখলে ফিরে এল। অথচ এই ক'দিন আগেও গত ১০ মার্চ ৫ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর দেখা গিয়েছিল লোকসভা ছেড়ে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে পঞ্জাবে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জিতে মুখ্যমন্ত্রী হন ভগবন্ত সিংহ মান।

ত্রিপুরায় চারটে বিধানসভা ছাড়াও একটা করে আসনে উপনির্বাচন হয়েছে দিল্লি, ঝাড়খণ্ড ও অন্ধ্রপ্রদেশে। শেষোক্ত রাজ্যে জগনমোহন রেড্ডির ওয়াইএসআর কংগ্রেস জিতেছে। ঝাড়খণ্ডে ক্ষমতাসীন জোটের শরিক কংগ্রেস যেমন জিতেছে তেমনি ত্রিপুরায় আগরতলা আসনটিও জিতে নিয়ে রাজ্য বিধানসভায় খাতা খুলেছে তারা। পেছনে ঠেলে দিয়েছে সিপিএম এবং রাজ্য থেকে বিজেপি সরকারকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার হুংকার ছাড়া তৃণমূল কংগ্রেসকে। তৃণমূল চলে গেছে চতুর্থ স্থানে। ফলে দিদির 'দাদা' হবার স্বপ্ন যে আরও ঘোলাটে হতে চলেছে এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব সরে গিয়ে জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলেন মানিক সাহাকে। এতদিন তাঁর প্রতি জনসমর্থন পরীক্ষিত ছিল না। কিন্তু ৪টির মধ্যে তিনটি আসনে জিতে তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বেও ত্রিপুরাবাসীর বিজেপির প্রতি যে পূর্ণ আস্থা রয়েছে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন তিনি। নিজে জিতেছেন বরদোয়ালি শহর আসনে। ৬ হাজার ১০৪ ভোটের ব্যবধানে

হারিয়ে দিয়েছেন কংগ্রেসের আশিস কুমার সাহাকে। ত্রিপুরার মতো ছোট্ট রাজ্যে এই ব্যবধান নিতান্ত হেলাফেলা করার মতো নয়। কারণ সেখানে মোট ভোট খুব বেশি পড়ে না। আগরতলার মতো রাজধানী শহরে জয়ী প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মণ ভোট পেয়েছেন সর্বসাকুল্যে ১৭ হাজার ২৮১টি। প্রাপ্ত ভোটের হার ৪৩.৪৬ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বিজেপি প্রার্থীর চেয়ে ৩ হাজার ১৬৩টি ভোট বেশি পেয়েছেন তিনি। বাকি যে দুই আসনে বিজেপি জয়ী হয়েছে সেগুলো হলো সুরমা ও যুবরাজনগর। তৃণমূলের সব প্রার্থীরই জমানত জব্দ হয়ে যাওয়ায় পিসি-ভাইপোর আর এক বঙ্গভাষী রাজ্য জয়ের স্বপ্ন এখন সুদূরপরাহত মনে করা যেতে পারে। দিদির দলের একজন শীর্ষনেতা তথা রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী যশবন্ত সিনহার কী হবে তা অনুমানের অসাধ্য নয়। উপনির্বাচন হলেও ত্রিপুরায় এই ফলাফলে এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর জাতীয় স্তরে দিদির নেতৃত্বের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে সে বিষয়ে এখন আলোচনা না করাই মনে হয় বাঞ্ছনীয় হবে।

দুই 'আজমগড়' দিয়ে শুরু হয়েছিল। একটা আক্ষরিক অর্থে বা নামে। অন্যটা ব্যুৎপত্তিগত অর্থে। সেটা হলো রামপুর। যা অনেকদিন ধরেই সমাজবাদী পার্টির দাপুটে নেতা আজম খানের গড় হিসেবে পরিচিত। দুই গড়েই পত পত করে উড়ছিল সাইকেল মার্কা লাল-সুবজ নিশান। গত ২৪ জুন সমাজবাদী পার্টির দুই প্রধান সেনাপতি, আজমগড়ে খোদ দল সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব এবং রামপুর নামের 'আজমগড়'-এ সম্প্রতি জামিনে মুক্ত আজম খানের দুর্গে সাইকেলের চাকা পাংচার করে গেরুয়া সবুজের মাঝে পাপড়িমেলা পদ্মফুলের নিশান উড়িয়ে দিয়েছেন সেখানকার নাগরিকরা। দুই লোকসভা কেন্দ্রের ভোটাররা দেখিয়ে দিয়েছেন জাতি ও ধর্মের মেল ঘটিয়ে তৈরি করা আপাত ভারী দুই পাথর আসলে জলে ভাসিয়ে দেওয়ার মতো অন্তঃসারশূন্য, হালকা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণায় এতদিন যা ছিল প্রায় অসম্ভব তা সম্ভব করেছেন দুই বিজেপি প্রার্থী। রামপুরে ঘনশ্যাম লোধী এবং আজমগড়ে ভোজপুরী চলচ্চিত্র তারকা দীনেশ লাল যাদব। যিনি 'নিরহুয়া' নামে বেশি পরিচিত।

গত বিধানসভা নির্বাচনে জিতে অখিলেশ আজমগড় লোকসভা কেন্দ্রটি ছেড়ে দিয়ে সেখানে দাঁড় করিয়েছিলেন তাঁর খুড়তুতো ভাই ধর্মেন্দ্র যাদবকে। যাদব-মুসলমান অধ্যুষিত এই কেন্দ্রে ২০১৪ সালে মুলায়ম নিজে এবং ২০১৯-এ তাঁর ছেলে অখিলেশ খুব ভালো ব্যবধানে জিতেছিলেন। এবারও জয় সম্পর্কে এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে অখিলেশ নিজে প্রচারে তেমনভাবে এগিয়ে পর্যন্ত আসেননি। কিন্তু দুই যাদবের লড়াইয়ে বিজেপি-র নিরহুয়ার কাছে তাঁর ভাইয়ের পরাজয় ঘটেছে ৮ হাজার ৬৭৯ ভোটের ব্যবধানে। বিজেপি প্রার্থী পেয়েছেন ৩ লক্ষ ১২ হাজার ৭৬৮ ভোট। ধর্মেন্দ্র যাদবের বাক্সে পড়েছে ৩ লক্ষ ৪ হাজার ৮৯ ভোট। লোকসভা নির্বাচন হিসেবে জয়ের ব্যবধান তেমন বড়ো নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে ২০১৯-এ অখিলেশ ছিলেন এসপি এবং বিএসপি-র জোট প্রার্থী। পেয়েছিলেন ৬ লক্ষ ২১ হাজার ৫৭৮ ভোট। আর নিরহুয়া পেয়েছিলেন ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৭৪ ভোট। এবার তার ৬২ হাজার ৮৬৪ ভোট বেড়েছে। মায়াবতীর বিএসপি এবার আজমগড়ের প্রার্থী করেছিল শাহআলম গুড্ডুকে। তিনি এখানে মহম্মদ জামালি নামে পরিচিত। তিনিও খুব একটা পিছিয়ে নেই। ভোট পেয়েছেন ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ১০৬টি। বহু দলীয় গণতন্ত্রে নানা দিক বিচার বিশ্লেষণ করে বিজেপি এবারও নিরহুয়াকেই প্রার্থী করে। সেই সঙ্গে যোগী আদিত্যনাথ যিনি এখন সবার কাছে মাফিয়া-ত্রাস 'বুলডোজার বাবা' হিসেবে খ্যাত তাঁর প্রচার কৌশল ও সাংগঠনিক কুশলতার জোরে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আজমগড়ের মতো এসপি গড়ে গেরুয়া নিশান উড়িয়েভারতীয় জনতা পার্টির নিরহুয়া পেয়েছেন ৩৪.৩৯ শতাংশ ভোট। এসপি প্রার্থী পেয়েছেন ৩৩.৪৪ আর মায়াবতীর প্রার্থীর ঝুলিতে পড়েছে ২৯.২৭ শতাংশ ভোট। নির্বাচনী রাজনীতির ময়দানে ক্যালকুলেশনে যিনি যত দড়, জয়ের নিরিখে তিনি তত বড়ো কৌশলী।

বিজেপি প্রার্থীর জয়ের ব্যবধান তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও লক্ষণীয় বিষয় হলো কেন্দ্রটা আজমগড়। এই লোকসভা কেন্দ্রের পেছনে একটা ইতিহাস রয়েছে। ১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৮৭ এবং ১৯৯৮ সালগুলোকে বাদ দিলে বাকি ১৩টা সাধারণ নির্বাচনেই জিতেছেন যাদব প্রার্থীরা। এখানে প্রথম উপনির্বাচন হয় ১৯৭৮-এ। ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রীয় লোকদলের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হবার পর ১৯৭৮ সালে উত্তরপ্রদেশে জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকারে মুখ্যমন্ত্রী রাম নরেশ যাদব লোকসভা আসনটি ছেড়ে দেন। উপনির্বাচনে জেতেন কংগ্রেসের মহসিনা কিদোয়াই। দ্বিতীয়বার উপনির্বাচন অনিবার্য হয় ২০০৮ সালে। কারণ বহুজন সমাজ পার্টি সাংসদ রমাকান্ত যাদব সমাজবাদী পার্টিতে চলে যাওয়ায় তাঁর লোকসভা সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়। উপনির্বাচনে জেতেন বিএসপি-র মুসলমান প্রার্থী আকবর আমেদ। যিনি বেশি পরিচিত 'ডামিস' নামে। আর এবার করহল বিধানসভা আসনে জেতার পর অখিলেশ যাদব আজমগড় লোকসভা আসন ছেড়ে দেওয়ায় উপনির্বাচন অনিবার্য হয়। এই প্রথম সেখানে উড়ল পদ্মফুলের নিশান। আজমগড়ে বিজেপির এই জয়কে অসম্ভবের সম্ভব মনে করা যেতে পারে। তবে এবার যে ঘটনা ঘটেছে তাহলো যাদব ভোটারেরা অনেকেই সমাজবাদী পার্টির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে এসেছেন বিজেপির দিকে। বিজেপি এবার এই কেন্দ্রে জয়ী হয়েছে তাই নয়, এসপি-র এম-ওয়াই (মুসলিম-যাদব) মিথকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি স্বতন্ত্র দেব সিংহের রণকৌশল।

প্রসঙ্গত, আজমগড় ও রামপুর লোকসভা কেন্দ্রে এই উপনির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী-সহ রাজ্য বিজেপির বড়ো বড়ো নেতারা প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সে সময় এ নিয়ে স্বতন্ত্র দেব সিংহকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'মনে রাখবেন আজমগড় ও রামপুর কেবল দুটো লোকসভা কেন্দ্রই নয়। সমাজবাদী পার্টির দুটো দুর্ভেদ্য কেল্লা।' এখানেই এই দুই কেন্দ্রের গুরুত্ব বোঝা যায়। অবশ্য বিজেপির রাজ্য সভাপতি সেদিন এও বলেছিলেন যে লড়াই কিন্তু

দুর্ভেদ্য মানে অভেদ্য নয়। তা যে নয় ২৬ জুনেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে ২০১৪ সালে আজমগড় থেকে জিতেছিলেন মুলায়ম সিং যাদব। সেবার মইনপুরী কেন্দ্র থেকেও তিনি জিতেছিলেন। কিন্তু মইনপুরী ধরে রেখে আজমগড় ছেড়ে দিয়েছিলেন এই ভরসায় যে তার স্থির বিশ্বাস ছিল এই কেন্দ্রে এসপি-র টিকিটে ল্যাম্পপোস্টকে দাঁড় করিয়েও এম-ওয়াই ফ্যাক্টরের জোরে তিনি জিতে যাবেন। আর এবারের উপনির্বাচনে তো তাঁর নিজের ভাইপোকেই টিকিট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এসপি-র প্রতিষ্ঠাতার সেই আত্মবিশ্বাস ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে পদ্মশিবির।

পাশাপাশি জমি মাফিয়া হিসেবে জেলে যাওয়া 'রামপুর কা শাহেনশা' আজম খানের দুর্গ ছারখার করে দিয়েছে বিজেপি। পদ্মপ্রার্থী ঘনশ্যাম সিংহ লোধী সমাজবাদী পার্টির মহম্মদ আসিম রাজাকে সরাসরি লড়াইয়ে ৪২ হাজার ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়ে পর্যবেক্ষক মহলকে রীতিমতো চমকে দিয়েছেন। এই কেন্দ্রে বিএসপি কোনো প্রার্থী দেয়নি। ওয়াকিবহাল মহলের মতে বিএসপি প্রার্থী দিলেও লোধী কেবল জিততেন তাই নয়, ব্যবধান আরও বেশি বেড়ে যেতে পারতো। কেননা, সেক্ষেত্রে মুখ্যত যে মুসলমান ভোটের জোরে আজমখানের রমরমা তার একাংশ চলে যেত বিএসপি-র দিকে। বিজেপি প্রার্থী যা ভোট পেয়েছেন তাতে তেমন কিছু হেরফের হতো না। এবার লোধী ভোট পেয়েছেন ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩৯৭টি। প্রদত্ত ভোটের প্রায় ৫২ (৫১.৯৬) শতাংশ। রামপুরের মতো কেন্দ্রে বিজেপির ক্ষেত্রে এটা একটা প্রায় অভাবনীয় ব্যাপার। অন্যদিকে সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী পেয়েছেন ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ২০৫ ভোট। যা কিনা ৪৬ শতাংশ। অর্থাৎ আজম খানের মতো একজন হেভিওয়েট প্রার্থীর ছেড়ে দেওয়া কেন্দ্রে তাঁর দলের প্রার্থী বিজেপি প্রার্থীর চেয়ে প্রায় ৬ শতাংশ ভোট কম পেয়েছেন। লোধী ১৯৯০-এর দশকে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত কল্যাণ সিং-এর হাত ধরে বিজেপি-তে আসেন।

কিন্তু কল্যাণ সিং যেমন এক সময় বিজেপি থেকে বেরিয়ে গিয়ে 'আপনা দল' গড়েও পরে বিজেপি-তে ফিরে এসেছিলেন তেমনি লোধীও এক সময় বিজেপি ছেড়ে প্রথমে বিএসপি এবং পরে সমাজবাদী পার্টিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ বছর (২০২২) বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি-তে ফিরে আসেন। তা সত্ত্বেও বিজেপি নেতৃত্ব তাঁর ওপর ভরসা রেখে এই উপনির্বাচনে তাঁকে টিকিট দেন।

জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও আজমগড় এবং রামপুর লোকসভা কেন্দ্র দুটি যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথাতেও। এই উপনির্বাচনের ফলাফল যেদিন প্রকাশিত হয় অর্থাৎ ২৬ জুন, মোদী তখন ছিলেন জার্মানির মিউনিখে। জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে সেখানে গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকেই বিজেপি প্রার্থীদের এই সাফল্যকে 'ঐতিহাসিক জয়' বলে অভিহিত করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রামপুর এমন একটা লোকসভা কেন্দ্র যেখানে মোট ভোটারের ৫০ শতাংশেরও বেশি হলেন মুসলমান। বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে ৫২ শতাংশ ভোট পড়ার অর্থ জলের মতো পরিষ্কার যে বেশ ভালো না হলে সেখানকার সমস্ত হিন্দু ভোট যার বেশির ভাগই যাদব, বিজেপির দিকে পড়লেও লোধীর জয়ী হবার কথা নয়। পাশাপাশি আজমগড়েও মুসলমান ভোটাদের হার ৪০ শতাংশের বেশি। হিন্দুদের মধ্যে কিছু শতাংশ দলিত ভোটার হলেও বেশিরভাগই যাদব এবং প্রায় প্রথাগতভাবে সমাজবাদী পার্টির সমর্থক বলে পরিচিত ছিলেন। সেই কেন্দ্রে ৩৪.৩৯ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজেপি প্রার্থী দীনেশ লাল যাদব 'নিরহুয়া'র জয়ও জাতীয় রাজনীতির স্তরে সবার চোখ খুলে দেবার মতো ঘটনা। স্পষ্ট, এই কেন্দ্রেও বহু মুসলমান বিজেপি-কে ভোট দিয়েছেন। না হলে মাত্র তিন মাস আগে হওয়া বিধানসভা নির্বাচনে যে আজমগড়ে মোট ১০টা আসনের ১০টাতেই সমাজবাদী পার্টি জয়লাভ করেছিল সেখানে লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির জয়ী হওয়ার দ্বিতীয় কোনো যুক্তি খুঁজতে যাওয়ার কোনো মানে নেই। এবং কেন মুসলমান-যাদবদের এই মত পরিবর্তনের শুরু তার ব্যাখ্যা বা উত্তর হতে পারে দুটো। প্রথমত, যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসনের বুলডোজারের চাকায় বিধ্বস্ত হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে নানা চরিত্রের মাফিয়া যারা এতদিন ভোটারদের ওপরও দাদাগিরি চালাতো। দ্বিতীয়ত, বিজেপি সরকারের সার্বিক উন্নয়ন। যার সরাসরি সুফল পাচ্ছেন তৃণমূল স্তরের মানুষ। হিন্দু-মুসলমান সবাই।

আর মাত্র দু' বছরেরও কম সময়ের মধ্যে হবে লোকসভা নির্বাচন। ২০২১ সালে বিধানসভায় জিতে ২০১৪-তেও 'খেলা হবে' বলে দিল্লি পর্যন্ত যারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁদের জোটের জোর কত তা হয়তো ১৮ জুলাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু দুই লোকসভা এবং ত্রিপুরায় ৪টে বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফল দেখে যোগী আদিত্যনাথ যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর বক্তব্য, '২৪-এ কী খেলা হবে ২২-এই তা নির্ধারিত হয়ে গেছে। ২০২২-এই ২০২৪-এর খেলা হয়ে গেছে। উত্তরপ্রদেশে বিজেপি ৬২ থেকে ৬৪-তে উঠেছে। ২৪-এ ৮০-তে ৮০টাই দখল করবে। এখন বাকি শুধু ২০২৪-এর জন্য দিন গোনা।' যোগীকে যাঁরা চেনেন তাঁরা জানেন যে তিনি কখনোই তেমন একটা আলগা কথা বলেন না। কথায় বলে, মাটির তলায় গাজর কত বড়ো তা বাইরে তার পাতা দেখলেই বোঝা যায়। ২০২২-এ ২০২৪-এর সেই পাতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য আর মাত্র ১৬-১৮ মাস অপেক্ষা করতে হবে। □

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

রাহুল গান্ধীকে ইডি তলব করার প্রতিবাদে কংগ্রেসের বিক্ষোভ।

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া-রাহুলের আচরণ সন্দেহজনক

হীরক কর

‘ন্যাশনাল হেরাল্ড’। যা নিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে বিতর্ক তুঙ্গে। এটি জাতীয় কংগ্রেসের অধুনা বন্ধ ইংরেজি মুখপাত্র। ‘ন্যাশনাল হেরাল্ড’ সংবাদপত্রটি প্রতিষ্ঠা করেন জওহরলাল নেহরু। সংবাদপত্রটি প্রকাশ করে অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড (এজেএল)। ১৯৩৭ সালে পাঁচ হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামীকে শেয়ারহোল্ডার হিসেবে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয় এজেএল। সংস্থাটি আরও দুটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করে। উর্দুতে ‘কওমি আওয়াজ’ এবং হিন্দিতে ‘নবজীবন’ নামে প্রকাশিত হয় ওই দুটি পত্রিকা। তিনটি কাগজই প্রকাশ করত অ্যাসোসিয়েট জার্নাল লিমিটেড নামের ওই প্রতিষ্ঠান। ন্যাশনাল হেরাল্ড যাত্রা শুরু করে ১৯৩৮ সালে। মূল উদ্যোক্তা ছিলেন জওহরলাল নেহরু। তাঁর সঙ্গে হাত মেলান প্রায় পাঁচ হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁদের আর্থিক অনুদানের টাকায় তৈরি হয় অ্যাসোসিয়েটেড জার্নাল লিমিটেড। তাদের হাতেই ছিল এই খবরের কাগজটির মালিকানা। দেশের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে এই পত্রিকা। সংবাদপত্রটি তার উগ্র এবং তীক্ষ্ণ লেখার জন্য ব্রিটিশ সরকারের রোষে পড়ে ১৯৪২ সালে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। যদিও তিন বছর পরে আবার চালু হয় এই প্রকাশনা।

১৯৪৭ সালে দেশের স্বাধীনতার পরে এই পত্রিকার চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন জওহরলাল নেহরু। কংগ্রেস দল এই সংবাদপত্রের মতাদর্শ গঠনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৩ সালে ন্যাশনাল হেরাল্ডের রজত জয়ন্তীতে একটি বার্তায়, নেহরু নিজেই বলেন, ‘স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি’ বজায় রেখে ‘সাধারণত কংগ্রেস নীতির পক্ষে’ বলে এই পত্রিকা। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে পত্রিকাটি আবার বন্ধ করার সময়, কংগ্রেসের কাছে এজেএলের ঋণ ছিল ৮০০ মিলিয়ন। ২০১০ সালে, কংগ্রেস এই ঋণ ইয়ং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডকে হস্তান্তর করে।

ইয়ং ইন্ডিয়া সেই অবস্থাতেই অ্যাসোসিয়েটেড জার্নাল তথা ন্যাশনাল হেরাল্ডকে অধিগ্রহণ করে। ন্যাশনাল হেরাল্ডের মালিক সংস্থা আসোসিয়েটেড জার্নাল লিমিটেডকে ঋণ মুক্ত করার জন্য তৈরি হয় ‘ইয়ং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড’ নামে এই নতুন সংস্থা। সংস্থার কর্ণধাররা সকলেই কংগ্রেসের নেতা-নেত্রী। সোনিয়া ও রাহুল গান্ধীর নামে ৩৮ শতাংশ করে মোট ৭৬ শতাংশ শেয়ার। বাকি ২৪ শতাংশ রয়েছে কংগ্রেস নেতা মোতিলাল ভোরা, অস্কার ফার্নান্ডেজ, সাংবাদিক সুমন দুবে এবং উদ্যোগপতি স্যাম পিত্রোদার হাতে।

নতুন কোম্পানি ন্যাশনাল হেরাল্ডের ৯০ কোটি টাকা ঋণ মেটানোর ভার নিল। বিনিময়ে ন্যাশনাল হেরাল্ডের যাবতীয় সম্পত্তি ইয়ং ইন্ডিয়াকে হস্তান্তর করা হয়। আসলে, ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ন্যাশনাল হেরাল্ড অধিগ্রহণ করে নেয় গান্ধী পরিবার তথা কংগ্রেস নেতাদের মালিকানাধীন সংস্থা ইয়ং ইন্ডিয়া লিমিটেড। তার বদলে হেরাল্ডের সব সম্পত্তি যেমন ইয়ং ইন্ডিয়ার হয়, তেমনই ৯০ কোটি টাকা দেনার বোঝাও ইয়ং ইন্ডিয়ার ঘাড়েই চাপে। কংগ্রেসের তরফে এর পর জানানো হয়, ন্যাশনাল হেরাল্ডকে দেওয়া ঋণ মকুব করে দেওয়া হচ্ছে। কারণ তা উদ্ধার করা যাবে না।

বিজেপির সুব্রহ্মণ্যম স্বামী এই বিষয় নিয়েই মামলা করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস

ইডি-র দপ্তরের পথে রাহুল গান্ধী।

রাজনৈতিক দল বলে তাকে আয়কর দিতে হয় না। কোনও বাণিজ্যিক সংস্থাকে কংগ্রেস এই ভাবে টাকা দিতে পারে না। ২০১২ সালে বিজেপি সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী দিল্লির আদালতে অভিযোগ করেন, ইয়ং ইন্ডিয়া কংগ্রেস দলকে মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে ৯০ কোটি টাকা ঋণ মকুব করিয়ে নিয়েছে। উলটে ন্যাশনাল হেরাল্ডের বাহাদুর শাহ জাফর মার্গের যে বাড়িটি ইয়ং ইন্ডিয়া নিজেদের নামে লিখিয়ে নিয়েছে সেটির বাজারমূল্য প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা।

স্বামী আদালতে প্রশ্ন তোলেন, কংগ্রেস যদি তাদের মুখপত্রের কাছে প্রাপ্য ৯০ কোটি টাকা মকুব করে দিতে চাইত তবে তারা নিজেরাই একটা প্রস্তাব গ্রহণ করে তা করে দিতে পারত। কেন তারা সে পথে না হেঁটে একটি নতুন কোম্পানি তৈরি করল?

তাঁর প্রশ্ন, হস্তান্তরের সময় সোনিয়া গান্ধী ছিলেন কংগ্রেস সভানেত্রী। কিন্তু রাহুল গান্ধী গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন না। কেন সোনিয়া ও রাহুলের নামে কোম্পানির ৭৬ শতাংশ শেয়ার বরাদ্দ করা হয়েছিল?

যে প্রতিষ্ঠানের নামে আড়াই হাজার কোটি টাকা মূল্যের বাড়ি রয়েছে, তারা কেন, ৯০ কোটি টাকা ঋণ মেটাতে সদ্য তৈরি কোম্পানিকে সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করল?

এর জবাব অবশ্য দায়সারা ভাবে দিয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেস এই মামলার মাধ্যমে বিজেপির বিরুদ্ধে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসার' অভিযোগ করেছে। তারা জানিয়েছে হেরাল্ড প্রকাশক এজেএলকে আর্থিক সমস্যায় সাহায্য করে কংগ্রেস। কংগ্রেস এজেএলকে প্রায় ৯০০ মিলিয়ন টাকা ধার দেয়। তাদের আরও দাবি ২০১০ সালে, এজেএল ঋণমুক্ত হয় যখন তারা ইক্যুইটির সঙ্গে তাদের ঋণ বদল করে এবং নতুন তৈরি হওয়া ইয়ং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডকে শেয়ার বরাদ্দ করে।

কংগ্রেসের বক্তব্য, ন্যাশনাল হেরাল্ড কাগজের নীতি কংগ্রেসের নীতির সঙ্গে মিলত বলেই সেই কাগজকে ঋণ দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। বিপুল সম্পত্তি গান্ধী পরিবারের হস্তগত করার চেষ্টা হয়েছে। স্বামীর ২০১২ সালের মামলার প্রেক্ষিতে দিল্লির আদালত আয়কর দপ্তরকে প্রথমে তদন্তের নির্দেশ দেয়। তাদের তদন্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে ইডিকে তদন্তভার দেয়। ২০১৫-তে আদালত সোনিয়া ও রাহুলকে সশরীরে কোর্টে হাজিরা থেকে মুক্তি দেয়। তদন্ত চলতে থাকে। সেই তদন্তেই সোনিয়া ও রাহুলদের এখন তলব করছে ইডি।

কংগ্রেস জানিয়েছে ইয়ং ইন্ডিয়া একটি 'অলাভজনক সংস্থা' এবং এর শেয়ারহোল্ডার এবং পরিচালকদের কোনও লভ্যাংশ দেওয়া হয়নি। তারা আরও জানিয়েছে, এজেএল ন্যাশনাল হেরাল্ডের মালিক, মুদ্রক এবং প্রকাশক হিসেবে থাকবে এবং সম্পত্তির কোনও পরিবর্তন অথবা হস্তান্তর হয়নি।

কংগ্রেসের মুখপাত্র অভিষেক মনু সিংভি জানিয়েছেন, সরকার ইডি এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ব্যবহার করছে। অভিষেক মনু সিংভি-র বক্তব্য, 'কোনও সম্পত্তি বা নগদ অর্থের লেনদেন হয়নি, তবে কীভাবে বেআইনি লেনদেন মামলায় তাদের তলব করা হলো?'

কংগ্রেসের দাবি সামাজিক কাজ করার জন্য ইয়ং ইন্ডিয়া লিমিটেড তৈরি করা হয়েছিল, কোনও লাভের জন্য এই

সোনিয়াকে তলব ইডির

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কংগ্রেসের অন্তবর্তীকালীন সভানেত্রী সোনিয়া

গান্ধীকে তলব করেছে ইডি। ২১ জুলাই হাজিরা দিতে হবে সোনিয়াকে। এই খবরে বেজায় চটেছে কংগ্রেস। প্রতিবাদ স্বরূপ কংগ্রেস ওই দিন সারা দেশে 'ভারত জোড়ো যাত্রা' নামের রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়েছে। উদ্দেশ্য, দেশে অস্থিরতা তৈরি করা। এর আগে, রাহুল গান্ধীকে যখন ইডি ডেকেছিল তখনও কংগ্রেস দিল্লির রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। চলতি মাসের ১৮ তারিখ থেকে সংসদে বাদল অধিবেশন শুরু হবে। সংসদেও বিজেপির 'প্রতিহিংসার রাজনীতির' প্রতিবাদ করবে কংগ্রেস।

এক নজরে ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলা

ইডির অভিযোগ

ন্যাশনাল হেরাল্ড সংবাদপত্রের মালিক অ্যাসোসিয়েটেন জার্নাল লিমিটেডকে অধিগ্রহণ করে ইয়ং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড। এর ফলে এজেএলের ৮০০ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তিরও মালিক হয়ে যায় তারা। আয়কর দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পরোক্ষে এই সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠেন সোনিয়া ও রাহুল গান্ধী। কারণ তাঁদের কাছেই আছে ইয়ং ইন্ডিয়ার ৭৬ শতাংশ শেয়ার। সুতরাং এই সম্পত্তির জন্য সোনিয়া-রাহুলের আয়কর দেওয়া উচিত।

কংগ্রেসের বক্তব্য

ইয়ং ইন্ডিয়া একটি অলাভজনক (নন-প্রফিট) সংস্থা। শেয়ার হোল্ডাররা এই সম্পত্তি থেকে কোনও আয় করেননি।

ইডির অভিযোগ

এজেএলের ঋণ হস্তান্তর করা ছাড়া ইয়ং ইন্ডিয়া এখনও পর্যন্ত কোনও কাজই করেনি। অলাভজনক সংস্থা হলে নিশ্চয়ই সমাজসেবামূলক কাজ করত।

কংগ্রেসের বক্তব্য

ইয়ং ইন্ডিয়ার একমাত্র কাজ ছিল সংবাদপত্র প্রকাশ করা। সেটাই এক্ষেত্রে সমাজসেবামূলক কাজ।

ইডির অভিযোগ

ইয়ং ইন্ডিয়া এজেএলের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছে। এই টাকার উৎস কী?

কংগ্রেসের বক্তব্য

ইয়ং ইন্ডিয়া ঋণ নিয়েছিল কলকাতার রমাপ্রসাদ গোয়েঙ্কা গ্রুপের ডোটেক্স মার্চেনডাইজ প্রাইভেট লিমিটেডের কাছ থেকে। সেই ঋণ সুদ-সহ চেকে শোধ করা হয়েছে।

ইডির অভিযোগ

ডোটেক্স একটা ভুয়ো কোম্পানি। শুধু ওই লেনদেনের জন্যেই তৈরি করা হয়েছে।

কংগ্রেসের বক্তব্য

যদি সব লেনদেন চেক মারফত হয় তাহলে কোম্পানি ভুয়ো হয় কী করে? অন্য সংস্থার কাজের কৈফিয়ত আমরা দেব না। আপনারা আরপিজি গ্রুপেও জিজ্ঞাসা করুন।

আরপিজি-র বক্তব্য

ডোটেক্স একটি বিনিয়োগকারী সংস্থা। রমাপ্রসাদ গোয়েঙ্কা গ্রুপের সব কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার। তবে ইয়ং ইন্ডিয়াকে কেন ঋণ দিয়েছিল ডোটেক্স সে ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছেন সংস্থার কর্তারা। শুধু এইটুকু জানিয়েছেন, ১ কোটি টাকার ঋণ ইয়ং ইন্ডিয়া শোধ করেছে বার্ষিক ১৪ শতাংশ সুদে।

(সৌজন্য এনডিটিভি)

ওয়াইআইএল তৈরি করা হয়নি। কংগ্রেস জানিয়েছে, কোনও লেনদেনই অর্থনৈতিক নয়, যা হয়েছিল সম্পূর্ণটাই বাণিজ্যিক।

কংগ্রেসের বক্তব্য, ন্যাশনাল হেরাল্ডের ঋণ মুক্তি, সম্পত্তি হস্তান্তর ইত্যাদির সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের কোনও সম্পর্ক নেই। এটি ছিল অলাভজনক উদ্যোগ। ইয়ং ইন্ডিয়াও ট্রাস্ট হিসাবে কাজ করে। এটির সঙ্গে লাভ লোকসানের কোনও সম্পর্ক নেই। ফলে ৭৬ শতাংশ মালিকানা সোনিয়া, রাহুলদের নামে থাকলেও তারা এক পয়সা কোম্পানি থেকে নেননি এবং সম্পত্তিরও তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে মালিক নন। কিন্তু সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর বক্তব্য, নতুন কোম্পানি তৈরি এবং সোনিয়া, রাহুলদের সিংহভাগ মালিকানা দেওয়াটাই রহস্যজনক। সেই কারণেই তিনি ফৌজদারি মামলা ঠুকেছেন। স্বামীর প্রশ্ন, ইয়ং ইন্ডিয়া ন্যাশনাল হেরাল্ডকে অধিগ্রহণ করার পর কেন ঋণ মকুব করে দিল কংগ্রেস? তাঁর দাবি, নয়াদিল্লি, লখনউ, ভোপাল, ইন্দোর, মুম্বই, পঞ্চকুলা, পাটনা-সহ বিভিন্ন শহরে ন্যাশনাল হেরাল্ডের যেসব বাড়ি এবং জমি রয়েছে, তার দাম প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা। ওই সম্পত্তির কিছুটা বিক্রি করেই কংগ্রেসের ঋণ মিটিয়ে দিতে পারত ইয়ং ইন্ডিয়া। কিন্তু সেই দাবি না জানিয়ে ঋণকে উদ্ধারের অযোগ্য বলে ঘোষণা করল কংগ্রেস। দলের আয়কর মুক্ত অর্থ ঘুর পথে চলে গেল সোনিয়া, রাহুল এবং আর কয়েকজন শীর্ষ কংগ্রেস নেতার হাতে। সুব্রহ্মণ্যম ২০১২ সালে সোনিয়া, রাহুল-সহ মেট ছ'জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ২০১৪-র জুনে আদালত অভিযুক্তদের সমন পাঠায়। দিল্লি হাইকোর্টে এই সমনের উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছিল। হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দেয়নি। সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী তাই আদালতে হাজিরা দেন এবং জামিন পান।

২০১৬ সাল থেকে এজিএল এবং তাতে কংগ্রেস নেতাদের ভূমিকা নিয়ে তদন্তে নামে ইডি বা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডা এবং প্রয়াত কংগ্রেস নেতা মোতিলাল ভোরাকেও অভিযুক্তদের তালিকায় রেখেছিল ইডি। তদন্তকারী সংস্থার দাবি ছিল, হরিয়ানার পঞ্চকুলায় এজেএলকে অবৈধভাবে জমি পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ এই কংগ্রেস নেতারা ব্যবহার করেছেন। মুম্বইয়ের বান্দ্রা এলাকায় একটি বহুতল নির্মাণের জন্য দিল্লির সিন্ডিকেট ব্যাংক থেকে লোন পেতেও সাহায্য করেছিল। ১৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা মূল্যের এই সম্পত্তি ২০২০ সালে বাজেয়াপ্ত করেছিল ইডি। □

আর কতকাল আমরা দাস হয়ে থাকব?

অবশেষে জট কাটল এসপ্লানেড মেট্রোরেলের বলে শোনা যাচ্ছে। ভিক্টোরিয়ার গেটের সামনে ২৮০ মিটার দূরে মেট্রো স্টেশনের নাম হবে ভিক্টোরিয়া। শুনে খুব তাজ্জব লাগে। এ প্রসঙ্গে বলি ইংল্যান্ডে স্টার্টফোর্ট অন আভনে বার্ড অব ইংল্যান্ড, উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের জন্ম স্থানে তাঁর মূর্তি স্থাপন করা আছে। তাঁর সামনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি মিলনের প্রতীক হয়ে উঠেছে জায়গাটি। এখানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সামনে ভিক্টোরিয়ার নামে মেট্রো স্টেশন হবে। এটা কীসের প্রতীক হবে? নিশ্চয় অত্যাচারী ইংরেজদের শোষণের প্রতীক হবে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলো ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিকতা এবং শোষণের প্রতীক। ভারতীয়দের শোষণ করে শোষিতদের টাকায় তৈরি হয় রানির ওই সুদৃশ্য স্মৃতিসৌধ। রানি ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয় ১৯০১ সালে। রানির স্মৃতিতে ভারতবর্ষের তৎকালীন ভাইসরয় কার্জন সাহেব ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক মহানগরী কলকাতায় মহারানির ওই স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলেন যা ইংরেজদের ঔপনিবেশিকতার স্মৃতিসৌধ। যা আমরা আজও গর্বের সঙ্গে বহন করছি। ওই স্মৃতিসৌধের কাজ শুরু হয় ১৯০৬ সাল থেকে এবং শেষ হয় ১৯২৬ সালে। আমরা জানি ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহ দেখা দিলে ইংরেজরা নির্মমভাবে ওই বিদ্রোহ দমন করে।

বিদ্রোহী সিপাহিদের সঙ্গে দেশীয় ছোটো ছোটো রাজা এই বিদ্রোহে যোগদান করেছিলেন। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ অর্থাৎ রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন অত্যাচারী ইংরেজ বণিক-সহ তাদের মদতদার স্বয়ং ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়া। মহাবিদ্রোহের পর ইংরেজদের গদি টলমল হলে ইংল্যান্ডের রানি আমাদের দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি আমাদের কাছে ঔপনিবেশিকতার প্রতীক ছাড়া আর কিছু নয়। তাই মহা বিদ্রোহের স্মরণে, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে নতুন মেট্রো স্টেশনের নাম হওয়া দরকার রানি লক্ষ্মীবাঈ। আমাদের দেশের রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের বীরত্ব, দেশপ্রেম শুধু কি ইতিহাসের পাতায় থাকবে? কেন আমরা তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবো না? কেন আমাদের স্টেশনের নাম সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়ার নামে হবে?

ইংরেজদের থেকে মুক্তি পেয়েছি ঠিক কথা, কিন্তু মুক্ত হতে পারিনি তাদের কালচারাল উপনিবেশ থেকে। আর কতকাল আমরা এভাবে দাস হয়ে থাকব?

—**সুবল সরদার,**
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

আর্থিক উন্নয়নশীল রাজ্যের তালিকায় অগ্রণী ওড়িশা

ওড়িশা দক্ষিণপূর্ব ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। নবীন পট্টনায়েকের সরকার ২২ বছর ধরে রাজ্য চালাচ্ছে। ১৯৯৮ সালে পিতা বিজু পট্টনায়েকের নামে বিজু জনতা দলের পত্তন। একটি আঞ্চলিক দল হিসেবে পরিচিত এই দলটি ১৯৯৮ সালে একুশ সংসদীয় আসনে তাঁর প্রতিনিধিত্ব ছিল নয়টি আসনে। ২০০০ সাল থেকে লাগাতার চারটি বিধানসভায় তিনি জয়ী। পড়শী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে যেখানে শাসক দল বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতিতে জেরবার, সেই সময়ে নবীনের ঘোরতর শত্রুও তাঁর বিরুদ্ধে অপশাসনের আঙুল তুলতে পারবে না। তাঁর এই জনপ্রিয়তা রাজ্যের অর্থনীতিকে অগ্রণী ভূমিকায় নিয়ে এসেছে। ২০০০ সালে নবীনবাবু যখন ক্ষমতাসীন হলেন তখন অর্থনীতিতে রাজ্য পিছনের সারিতে। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে রাজ্যের উত্তরণ ঘটল। ক্রমশ এই উত্তরণ ২০১৮-১৯-এ নবম স্থানে, পশ্চিমবঙ্গের ঠাঁই হলো একাদশে। প্রায় প্রতি বছর প্রকৃতির রোষানলে পড়ে ওড়িশা।

৯৯-তে যখন ক্ষমতাসীন হলেন নবীন পট্টনায়েক, সেবছর অক্টোবরে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের মুখে পড়ে ওড়িশা। তৎপরতার সঙ্গে ক্ষয়ক্ষতি সামলে রাজ্যের পুনর্গঠন করলেন। পরবর্তী ২০০০ দশকগুলিতে আর্থিক উন্নয়নের হার নবীনবাবু নামতে দেননি গড়পরতা ৭.২ শতাংশ নীচে। বিগত ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ এই পাঁচ বছরে বার্ষিক উন্নয়নের হার ৮.৮ শতাংশ ধরে রেখেছে ওড়িশা। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে রাজ্যের শহরবাসীর সংখ্যা মোট সংখ্যার ১৭ শতাংশ।

এই হার প্রাক স্বাধীনতা দেশের জনসংখ্যার তুলনায় কম। রাজ্যের তপশিলি উপজাতি, জাতির সংখ্যা যথাক্রমে ২৩ ও ১৭ শতাংশ। এই বিপুল মাত্রার উপজাতি জনসংখ্যা নিয়ে একটি রাজ্য ২০০৪-০৫ সাল থেকে ২০১১-১২ সাল পর্যন্ত দারিদ্র্য সীমারেখার ওপরে উঠেছে প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষ। ২০০৪-০৫-এ ৫৮ শতাংশ, ২০১১-১২-তে ৩৩ শতাংশ।

কিন্তু প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতো আজও দেশের তুলনায় ওড়িশার উচ্চ বেতনের চাকরি কম। গড় রাজ্য ঘরোয়া উৎপাদনের নিরিখে ১৫ শতাংশ যখন শ্রমিক ৪৮ শতাংশ। এই সংখ্যা শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরে নিযুক্ত কর্মীর তুলনায় ২০ শতাংশ কম। কৃষিক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের কাজ দেবার মতো জায়গা এখনও প্রস্তুত হয়নি। ওড়িশায় আগামীদিনে নবীন সরকারকে বস্ত্র, চর্মশিল্প, হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে অগ্রাধিকার দিতে হবে যেখানে বিপুল নিয়োগ সম্ভব।

—**তারক সাহা,** হিন্দমোটর, হুগলী।

ফঃ ৩

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে গণতন্ত্র !

এ যেন ভূতের মুখে রাম নাম। ঠিক তেমনি মমতার মুখে গণতন্ত্রের কথা! ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই তার গণতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হাড়ে হাড়েই টের পেয়েছে। তাই আজ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যারপরনাই অবাক। বিগত নির্বাচনে বিজেপি ও শিবসেনা জোট বেঁধে মানুষের কাছে ভোট প্রার্থনা করেছিল। মানুষ তাদের বিশ্বাস করে সরকার গঠনের সুযোগ দিয়েছিল। বিজেপির অর্ধেক আসন পেয়ে শিবসেনা প্রধান কুচক্রীদের হাতে পড়ে। সেই কুচক্রী এনসিপি ও কংগ্রেস তাকে মন্থরার মতো বুদ্ধি দিয়ে বলে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি দাবি করতে। উদ্ভব ঠাকরেও সেই ফাঁদে পা দেয়। যথারীতি বিজেপিও সেই অন্যায় দাবি খারিজ করে দেয়। রাজনীতির কুচক্রীমহল (আজকের গণতন্ত্র প্রেমী) সেদিন আহ্লাদে আটখানা হয়ে তোড়জোড় করে সরকার গঠন করে মহারাষ্ট্রের মানুষের ইচ্ছাকে পদদলিত করে। এটাই কি মমতার গণতন্ত্র? সেইদিন বিজেপিকে আটকে তোড়জোড় করে সরকার গঠনটা বড়ো মিষ্টি লেগেছিল। আজ সেটাই তেতো লাগছে। তাই গণতন্ত্রের কথা মনে পড়ছে। তাইতো? ওই জোট সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ আজ জেলে বন্দি। পুলিশ পোস্টিং করে তিনি তোলা তুলতেন। এই কথা পুলিশ কমিশনার কোর্টে এফিডেবিট দাখিল করে মামলা দায়ের করেন। আর এক মন্ত্রী নবাব মালিক জেলে। অন্ধকার জগত ও ডি-কোম্পানির সঙ্গে তার যোগ প্রমাণিত।

রাজ্যসভার ও বিধান পরিষদের নির্বাচনের সময় হাইকোর্ট তাদের ভোট দানের জন্য জামিন দেয়নি। মমতার কথায় আজও তারা মন্ত্রী। এতো বড়ো অভিযোগ যদি কোনো সরকারি কর্মচারী বা অফিসারের বিরুদ্ধে থাকতো তাহলে কি তারা পদে থাকতো? না থাকতো না। তাহলে আজও কী করে অনিল দেশমুখ ও নবাব মালিক পদে রইলেন? শুধু তারা বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বলে এই পুরস্কার পেলেন। এই তো মমতার গণতন্ত্র।

মুকুল রায় ২০২১-এর বিধান সভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে কৃষ্ণনগর দক্ষিণ আসন থেকে নির্বাচিত বিধায়ক হন। তারপর মুকুল রায় তৃণমূলের কার্যালয়ে গিয়ে মমতা ব্যানার্জি ও তার ভাইপোর সামনে তৃণমূলে যোগদান করেন। টিভির পর্দায় রাজ্যবাসী তা চাক্ষুষ করার পরও তাকে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়। বিজেপির সঠিক দাবিকে কর্ণপাত করা হলো না। বিজেপি পরে স্পিকারের কাছে আপত্তি জানালে স্পিকার সাহেব তার অনুপ্রেরণায় জানিয়ে দেন, 'মুকুল রায় তৃণমূলে যোগদান করেননি। তিনি এখনও বিজেপির বিধায়ক।' রাজ্যবাসী কি মূর্খ? মোটেই না। আজ গণতন্ত্র নেই, গণতন্ত্র ধ্বংস বলে চিলচিৎকার করলেও কেউ আর পাশে দাঁড়াবে না।

পর পর ভয় দেখিয়ে সিপিএম-কংগ্রেসের এমএলএ ও বিভিন্ন পৌরসভার ও কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও কমিশনারকে ভাঙিয়ে তৃণমূলে যোগদান করিয়েছেন। শুধু কী তাই, গ্রামের পঞ্চায়েত গুলোকেও পুলিশ দিয়ে ভয় দেখিয়ে ভেঙেছেন। ক্ষমতা-অর্থবল কি সেদিন প্রয়োগ করেননি? কোন মুখে আজ মোদীজীকে দোষ দিচ্ছেন? কংগ্রেস নেতা মানস ভুঁইয়া কী ভালোবেসে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিল? এইতো সেদিন আপনার মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জি বিজেপিতে যোগদানের পর আপনি তার দপ্তরের নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ তুলে আদালতে মামলা করার কথা বলেছিলেন। যেই রাজীব ব্যানার্জি তৃণমূলে ফিরে গেল অমনি আপনার সিংহের গর্জন বিড়ালের মতো ম্যাও ম্যাও করতে লাগলো। এই তো আপনার গণতন্ত্র। আসলে আপনি গণতন্ত্রে মোটেই বিশ্বাসী নন। আপনি মিথ্যাতন্ত্রে বিশ্বাসী।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

নারী-পুরুষ একসঙ্গে নমাজ পড়া রীতিবিরুদ্ধ

আপনার পত্রিকার মাধ্যমে আমার একটি বক্তব্য প্রকাশ করতে এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এমন কিছু কাজ করছেন যা খুবই লজ্জার ও আপত্তিকর। যেমন তিনি ঈদ উপলক্ষ্যে যে নমাজ হয়েছিল কলকাতায় তাতে পুরুষদের সঙ্গে তিনি নমাজ আদায় করেছিলেন। এটা মুসলমান সমাজে নিয়ম বিরোধী। নমাজের মাঠে কেবলমাত্র পুরুষরাই নমাজ পড়েন। মহিলারা নিজের বাড়িতে নমাজ পড়েন। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি পুরুষদের সামনে বসে নমাজ পড়েছেন গতবছর কলকাতার মাঠে।

মুসলমানদের ভোট পাবার জন্য তিনি এই সব কাণ্ড করছেন কিন্তু এগুলি রীতি বিরুদ্ধ। এটা মুসলমান সমাজের অপমান। খুব লজ্জার। সব মুসলমানদের এই বিষয়ে আপত্তি করা উচিত। মমতা ব্যানার্জি যে কত নামের কাঙাল তা এতে পরিষ্কার হয়ে গেল।

আপনার পত্রিকা অনেকে পড়ে, তাই আপনাকে এই বিষয়ে মতামত জানাতে লিখলাম। ভবিষ্যতে যাতে মমতা ব্যানার্জি এই কাজ না করেন সেজন্য হিন্দু-মুসলমান সকলের আপত্তি থাকা দরকার। বিশেষ ভাবে মুসলমান ভাইদের এই বিষয়ে আপত্তি জানানো প্রয়োজন।

—সুলতানা বেগম,
মোথাবাড়ি, মালদহ।

With Best Compliments from -

A Well Wisher

নারীর পূর্ণতা লাভের মননশীল অঙ্গীকার ‘পবিত্র’

রাখী ব্রহ্ম

উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতবর্ষে নারীরা পূজিত হয়েছে আদিকাল থেকে— কখনও মাতৃরূপে, কখনও জন্মভূমিরূপে, কখনো-বা দেবীরূপে। নারীরা হলেন স্রষ্টার সৃষ্টির এক অনবদ্য অংশ। ‘Menstruation, Period কিংবা ঋতুস্রাব মহিলাদের হয় বলেই তাঁরা মাতৃত্বের স্নেহপূর্ণ অনুভূতি অনুধাবনে সক্ষম। ভারতে প্রাচীনকাল থেকে অঙ্গপূজা চলে আসছে। আর এই কারণেই অম্বুবাচী তিথিতে আজও কামাখ্যামায়ের যোনীঅঙ্গ পুজিত হয়। মাতৃঅঙ্গ হলো ভারতীয় সংস্কৃতিতে এক পবিত্র অংশ যা থেকে আগামী প্রজন্ম পৃথিবীর বুকে ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু এই পূজিত নারীই আবার ঘরে ঘরে অবহেলার স্বীকার হন। তাঁদের কোথাও কোথাও দেখা হয় সন্তান সৃষ্টির কারখানা হিসেবে। তাঁদের পিরিয়ডের সময়কে অশুচি, অপবিত্র ধরা হয়। এমনকী পিরিয়ড চলাকালীন নির্দিষ্ট দিনগুলিতে তাঁদের অবহেলার চোখে দেখা হয়। কিন্তু ভালো করে আমরা যদি ভাবি তাহলে দেখতে পাবো যে নারীদের পিরিয়ড হয় বলেই নারীরা মাতৃশক্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো ভারত-সহ তৃতীয় বিশ্বের মহিলারা আজও নানা প্রকারের অবহেলা ও লাঞ্ছনার শিকার।

পরিসংখ্যান ঘাঁটলে দেখা যাবে, প্রথম পিরিয়ড অর্থাৎ মাসিক শুরু হওয়ার আগে ৬৬ শতাংশ ভারতীয় মহিলা এ বিষয়ে অজ্ঞ। ২৩ শতাংশ গ্রামীণ ভারতীয় মেয়েরা অজ্ঞতার দরুণ প্রথার বেড়াজালে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন পিরিয়ড শুরুর পরে। ১৪ শতাংশ মেয়েরা মেনস্ট্রুয়াল ইনফেকশনের স্বীকার হন। কখনো-বা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। পেটব্যথা, পলিসিস্টিক ওভারি, সিস্ট টিউমার, ক্যানসার এগুলো এখন প্রত্যেক ঘরে ঘরে সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ হলো অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, সেই সঙ্গে পিরিয়ড সম্পর্কে অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, উপযুক্ত যোগব্যায়ামে অনীহা। কিন্তু মায়েদের আঁচলের স্নেহের স্পর্শে যে নারী বড়ো হয়েছে, তাঁরা যদি অন্ধকারে হারিয়ে যায় তবে সমাজও পিছিয়ে পড়বে।

ভারতীয় যোগ ও ধ্যানের অন্যতম পুরুষ শ্রীশ্রীরবিশঙ্কর কোটি কোটি মহিলার জন্য এক নতুন পথের দিশা দেখিয়েছেন। আর্ট অব লিভিং সংস্থা ২০১৮ সালের ৮ মার্চ এক নতুন প্রোজেক্টের সূচনা করেছে। ভারতের চব্বিশটি রাজ্য-সহ বিশ্বের পাঁচটি দেশে (আফ্রিকা, কম্বোডিয়া, হংকং, ভুটান) ৩৬০০ শিক্ষকের সহযোগিতায় তিনদিনের সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ মেয়ের জীবনযাত্রা। ‘পবিত্র’ প্রোজেক্টের কল্যাণে উপকৃত হয়েছে অসংখ্য গ্রামের মানুষ, শহরের মানুষ।

কথা হচ্ছিল গীতা সরকারের সঙ্গে। তিনি জানান, সেদিনের শিবিরে অংশগ্রহণ করে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, ব্যায়াম, মুদ্রা ইত্যাদি করার পর পিরিয়ড কালীন পেটব্যথা ও ওভারি সিস্ট কোনোটিই এখন তাঁর নেই।

অনিতা দত্ত একজন সাধারণ গৃহবধু। তিনি জানান, এই শিবির থেকে তিনি অনেক কিছু পেয়েছেন। তিনি চান সব মহিলা তাঁর মতো ভালো থাকুক। শিবিরে অংশগ্রহণকারী আরেক গৃহবধু দিশা সেনের কথায়, ‘পবিত্র শিবিরে গিয়ে বুঝতে পেরেছি আমরা মহিলারা আসলে সৃষ্টির এক অনবদ্য অংশ।’

বাস্তবে পবিত্র প্রোজেক্টের মাধ্যমে গ্রামে, শহরে প্রচুর মহিলা আজ আশার আলো দেখছেন। কী করে একজন নারী সুস্থ সবল থাকতে পারে, পিরিয়ডকে অশুচি হিসেবে না দেখে বরং সৃষ্টির এক অমোঘ সত্যকে যথাযথ পবিত্রতার সঙ্গে স্বীকার করতে পারে, ভাবনাগুলোকে পরিবর্তিত করে নারীরাও যে এক নতুন দিনের আলো হিসেবে উঠে আসতে পারে তা বোঝার দিন এসেছে।

পিরিয়ড অপবিত্র নয়, বরং পবিত্র। এই ভাবনাই মেয়েদের নতুন পথ দেখাচ্ছে। একজন মা কখনও অপবিত্র হতে পারে না। আবার কষ্টকর জীবন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না।

সমগ্র ভারতবর্ষে পবিত্র প্রজেক্ট যদি সর্বস্তরে কার্যকর হয় তাহলে সত্যিই একদিন জাতির জাগরণ হবে। তার জন্য দরকার সমাজ ও সরকারের আরও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা। তবে একটি নয় প্রত্যেকটি গ্রামে আশার আলো ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। পিরিয়ড কোনো লজ্জার ব্যাপার নয়, ক্ষতিকারক ব্যাপারও নয়। বরং আমরা নারীরা গর্ব করতে পারি। আগামী প্রজন্মকে পরম মমতায় স্থান দিতে পারি জঠরে। পবিত্র প্রোজেক্টের মাধ্যমে আশা রাখি আগামী প্রজন্ম স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর মনের অধিকারী হবে। এক নতুন ভারতের জন্মলাভ হবে। চারদিকের বাতাবরণে থাকবে শুধু শান্তির হাতছানি। এ যেন মায়ের বুক চিরে ফল্গুনদীর নির্মল ধারা আর নতুন সৃষ্টির পথকে সুন্দর করার অঙ্গীকার। □

মাংকি বি ভাইরাস সম্পর্কে বিশদে জানুন

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

সমগ্র বিশ্ব একদিকে যেমন করোনা ভাইরাসের নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্টের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, তার মধ্যেই চীনে একটি নতুন ভাইরাসের আক্রমণে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ওই ব্যক্তি মাংকি বি ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন। বেজিঙের ওই পশুচিকিৎসক চীনের প্রথম ব্যক্তি যিনি মাংকি বি (সংক্ষেপে বিভি)-তে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। প্রথমদিকে তার শরীরে জ্বর, গা বমি ভাবের মতো উপসর্গ ছিল।

কী এই মাংকি বি ভাইরাস? : মাংকি বি ভাইরাস খুব বিরল ধরনের একটি ভাইরাসের সংক্রমণ। এটি হারপিস গোত্রের ভাইরাসের অন্তর্গত, যার মধ্যে হারপিস জোস্টার ও হারপিস সিমপ্লেক্স আছে। বাঁদর ছাড়া, ম্যাকাও, শিম্পাঞ্জি-সহ অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। রোগটা একদিকে যেমন খুব একটা কমন নয়, তেমনি খুব বেশি প্রাণঘাতীও নয়। এটি পশু থেকে মানুষের মধ্যে ছড়ায় এবং সংক্রমিত করে। যদিও তার হার খুবই কম।

সংক্রমণ : বাঁদরের থেকে এই ভাইরাসটি মানুষের দেহে আসে। বাঁদরে কাশির ড্রপলেট, বডি ফ্লুইড, মূলত থুতু, মুখের লালা, ইউরিন, রক্তের নমুনা মানুষের সংস্পর্শে এলে মানুষের মধ্যে রোগটি আসতে পারে। আবার বাঁদরের কামড়, আঁচড়ানো থেকেও হতে পারে এই রোগ। এখনও পর্যন্ত বাঁদর বা উপরে উল্লিখিত প্রাণীর দেহ থেকে মানুষের দেহে যে ভাইরাস এসেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

কারা ঝুঁকিতে : যেসব ব্যক্তি বাঁদরের কামড় খেয়েছেন বা বাঁদর কোনওভাবে তাঁদের আঁচড়েছে তাঁদের ঝুঁকি বেশি থাকে। পশু চিকিৎসক বা বাঁদর নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন তাঁদের মধ্যে সহজেই মাংকি বি ভাইরাস ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা আছে। কিংবা যাঁরা বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়ান তাঁরাও ঝুঁকিতে আছেন।

উপসর্গ : এই ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বেশ কয়েকটি উপসর্গ থাকে, যার সঙ্গে অন্যান্য ভাইরাল সংক্রমণের মিল রয়েছে যেমন— সারা গায়ে, হাত-পায়ে ব্যথা, পেশিতে প্রবল যন্ত্রণা, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, নাক দিয়ে জল পড়া, চোখ থেকে জল পড়া, অল্প জ্বর আসা। অনেক সময় এই মাংকি বি ভাইরাস মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডকে আঘাত করে, যার ফলে রোগীর নানাবিধ স্নায়ুজনিত সমস্যা হয়। যেমন স্মৃতি নষ্ট হয়ে যাওয়া, পেশি সঞ্চালনায় অসুবিধে (যেহেতু এই কাজটি নিয়ন্ত্রিত হয় মস্তিষ্ক দ্বারা)। একই কারণে বিভিন্ন পেশির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষাও হয় না, ব্রেন ফগে আক্রান্ত হন রোগী।

যদিও ভাইরাসটি আপাতভাবে প্রাণঘাতী নয়, তবে ক্ষেত্রবিশেষে হয়ে উঠতে পারে, তখন এর থেকে এনকেফেলাইটিস বা মস্তিষ্কে প্রদাহ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের দেওয়া তথ্যমতে, কোনও ব্যক্তি বিভিন্ন ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার প্রায় মাসখানেক পর থেকে তাঁর শরীরে উপসর্গগুলি দেখা দেয়।

এই মাসখানেক সময়কে উইন্ডো পিরিয়ড বলে। কারও ক্ষেত্রে আবার তিন থেকে সাতদিনের মধ্যেও লক্ষণ দেখা দেয়। নির্ভর করে ওই ব্যক্তির শরীরে ভাইরাল লোড কতটা তার উপরে।

সতর্কতা ও চিকিৎসা : এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা ফ্লুইড থেরাপি। কোনও ব্যক্তির শরীরের যে অংশে বাঁদরের কামড় বা আঁচড়ানোর দাগ আছে, সেই জায়গাটা বারে বারে মেডিকেটেড সাবান বা আয়োডিন দিয়ে ধুয়ে যেতে হবে পনেরো মিনিট করে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর। কিন্তু যদি উপসর্গগুলি মারাত্মক হয় এবং রোগীর অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যায়, তাহলে চিকিৎসকের সহায়তা প্রয়োজন।

এর থেকে সতর্ক থাকতে কী কী করবেন : বনজঙ্গলে যেতে হলে উপযুক্ত পোশাক পরুন। বাঁদর বা অন্যান্য প্রাণী নিয়ে কাজ করতে গেলে মাস্ক ও শরীরে উপযুক্ত পোশাক পরুন, যাতে বডি ফ্লুইডের সংস্পর্শে না আসতে পারে। যেহেতু এখনও পর্যন্ত এর কোনও ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়নি, সতর্কতাই একমাত্র রাস্তা। তবে লক্ষণ অনুযায়ী হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সারাসেনিয়া, জেলসিমিয়াম, ভ্যাকসিনিলম প্রভৃতি ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

খাদ্য সংকটে জেরবার শ্রীলঙ্কার নাগরিক।

ড্রাগনের বিষে জর্জরিত শ্রীলঙ্কা

চন্দ্রভানু ঘোষাল

শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি ভবনে ক্ষিপ্ত জনতার ঢুকে পড়ার দৃশ্য নিশ্চয়ই সবাই টিভিতে দেখেছেন। এই ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলে মনে হলেও, শ্রীলঙ্কার মতো অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত একটি দেশে অস্বাভাবিক নয়। বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল পরিবেশিত খবরে দেখা গেছে ক্ষুব্ধ জনতা সুইমিং পুলে নেমে পড়েছে। একজন মহিলাকে দেখা গেছে রাষ্ট্রপতি ভবনের কিচেনের ফ্রিজ খুলে দেখছেন কিছু খাবার পাওয়া যায় কি না। অনেকদিন পেট ভরে খেতে না পাওয়ার এই ছবি স্তম্ভিত করে দিয়েছে সারা বিশ্বকে। সবাই এর জন্য দায়ী করছে চীনকে। পশ্চিমি দেশগুলি তো বটেই, ভারতের অর্থনীতিবিদেরাও বলছেন চীনের ঋণের ফাঁদ এবং শ্রীলঙ্কার সরকারের অদূরদর্শিতার মাশুল গুনছে দেশটি। এখানে একটি প্রশ্ন উঠবে, চীনের মতো দেশ কীভাবে ঋণের ফাঁদ পেতে অন্য একটি দেশকে সর্বস্বান্ত করতে পারে বা ঋণের ফাঁদ পাতা কূটনীতির মানে কি?

রাষ্ট্রপতি ভবনের দখল নিয়েছে বিক্ষোভকারীরা।

ঋণের ফাঁদ পাতা কূটনীতি

ইংরেজিতে বললে ডেট ট্র্যাপ ডিপ্লোম্যাসি। বাংলায় ঋণের ফাঁদ পাতা কূটনীতি। একটি দেশ যখন এই ভাবনা থেকে অন্য কোনও দেশকে ঋণ দেয় সেই ঋণ-গ্রহীতা দেশটি ঋণ শোধ করতে না পারলে ঋণদাতা দেশ তাকে খেলাপি ঘোষণা করবে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে দেশটি দখল করবে তখন এই ঋণনীতিকে বলে ঋণের ফাঁদ পাতা কূটনীতি। শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সঙ্গে এমনটাই করেছে চীন। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ব্রহ্ম চেলানি বলেন, 'ঋণের ফাঁদ পাতা অর্থনীতি নিঃসন্দেহে চীনের ভূরাজনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গ। চীনের সরকার যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রকল্পের মূল্য নির্ধারণ বাজারদরের থেকে চড়া দামে করে এবং দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করতে গিয়ে প্রকল্পের সব কাজ চীনা কোম্পানিকে দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করে তার বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে।' শুধু ব্রহ্ম চেলানি নন, ২০১৮ সালে আমেরিকার ১৬ জন সেনেটর এই একই অভিযোগ করেছিলেন। ওই বছরেই আমেরিকার প্রাক্তন স্টেট সেক্রেটারি মাইক পম্পিয়ো বলেছিলেন, 'ঋণ দেবার জন্য চীন আলাদা করে ঘুষ নেয়।'

রাষ্ট্রপতি পদে রণিল উইক্রমসিঙ্ঘে

গোতাবায়া রাজাপক্ষ দেশত্যাগ করায় প্রধানমন্ত্রী রণিল উইক্রমসিঙ্ঘেকে কার্যনির্বাহী রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কা। রাষ্ট্রপতি হয়েই রণিল উইক্রমসিঙ্ঘে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। এখনও পর্যন্ত যা খবর তাতে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী বিক্ষোভ থামাতে শূন্যে গুলি ছুড়েছে। কাঁদনে গ্যাসের শেলও ফাটানো হয়েছে। কিন্তু তাতে ফল কিছু হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর অফিস এখনও (১৪.৭.২২) বিক্ষোভকারীদের দখলে

হামবানতোতা

চীনের আগ্রাসী ঋণ-কূটনীতির প্রমাণ শ্রীলঙ্কার হামবানতোতা বন্দর। ২০০৭ সালে চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত দুই সংস্থা চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি ও সিনোহায়ড্রো করপোরেশন হামবানতোতা বন্দর নির্মাণের দায়িত্ব পেয়েছিল। খরচ ধরা হয়েছিল ৩৬১ মিলিয়ন ইউএস ডলার। যার ৮৫ শতাংশ ঋণ হিসেবে দিয়েছিল চীনের এক্সিম ব্যাংক। সুদের হার ছিল বার্ষিক ৬.৩ শতাংশ। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল প্রকল্পটি লাভজনক নয়। লোকসানের বহর দিন দিন বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে চড়া সুদের চাপ। অভিযোগ, ঋণের কিস্তি নিয়মিত না পেয়ে এই সময় থেকে চীন মারাত্মক চাপ দিতে থাকে এবং শ্রীলঙ্কার সরকার বাধ্য হয় হামবানতোতা বন্দরটি চীনের মার্চেন্ট পোর্টের কাছে ৯৯ বছরের জন্য লিজ দিতে। এর জন্য শ্রীলঙ্কাকে দেওয়া হয় ১.১২ বিলিয়ন ইউ.এস ডলার। কিন্তু এটা কি একটা সাধারণ ঋণ-খেলাপির সম্পত্তি ক্রোক করার ঘটনা? না, তা নয়। এর পিছনে অন্য গল্প আছে। আমেরিকা, জাপান ও ভারতের অভিযোগ হামবানতোতা বন্দরকে ভারত মহাসাগরে নৌ-ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে চায় চীন। সুতরাং বিপদ যে ভারতের সব থেকে বেশি সেটা বলাই বাহুল্য।

চীনের পৌষমাস, শ্রীলঙ্কার সর্বনাশ

শ্রীলঙ্কা এই মুহূর্তে দেউলিয়া দেশ। মার্চ ২০২২-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী শ্রীলঙ্কার বিদেশি মুদ্রাভাণ্ডার এখন মাত্র ১.৯ বিলিয়ন ইউ.এস ডলার, যা দিয়ে বিদেশি ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। বিদেশি ঋণের পরিমাণ ৪ বিলিয়ন ডলার। জুলাই ২২-এর মধ্যে আন্তর্জাতিক বন্ডের কিস্তি শোধ করার জন্য প্রয়োজন ১ বিলিয়ন ডলার। এর ফলে মারাত্মক এক অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে হু হু করে। সাধারণ ওষুধপত্র তো বটেই, জীবনদায়ী ওষুধের জোগান পর্যন্ত বন্ধ। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস অগ্নিমূল্য। সাম্প্রতিক একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, শ্রীলঙ্কায় পেট্রোল প্রতি লিটার ৩৫০ টাকা। দুধ প্রতি লিটার ১৮০ টাকা। রান্নার গ্যাস নেই।

এই সংকটের শুরু ২০১৫ সালে। এমনটাই জানিয়েছেন সেন্ট্রাল ব্যাংক অব শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর ডব্লুউ.এ. উইযেওয়াদেনা। বিপুল আর্থিক সংকট যে আসতে পারে সে ব্যাপারে শ্রীলঙ্কার সরকারকে সাবধান করেছিল ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ অব শ্রীলঙ্কা। তখন প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমসিঙ্ঘে। তিনি সংস্কারে নজর দেন। কিন্তু সরকারেরই একাংশের গয়ংগচ্ছ মনোভাব এবং সাধারণ মানুষকে তাৎক্ষণিক কিছু পাইয়ে দেবার রাজনীতির কারণে সরকারের সংস্কার প্রক্রিয়া বেশিদূর এগোতে পারেনি। এছাড়া, মূলত চারটে কারণকে শ্রীলঙ্কার এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী করা হচ্ছে— মাত্রাতিরিক্ত করছাড় ও সম্পদ সৃষ্টির প্রয়াস, বিদেশি ঋণ, ঋণের ফাঁদ এবং ফরেন রেমিটেন্সের হ্রাস।

করছাড় ও সম্পদ বৃদ্ধি

শ্রীলঙ্কার অধুনা পলাতক রাষ্ট্রপতি গোটাবায়া রাজাপক্ষ

গোতাবায়া এখন মালদ্বীপে

শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপক্ষ জনরোষের কারণে দেশ ছেড়ে এখন মালদ্বীপে আশ্রয় নিয়েছেন। যদিও মালদ্বীপেও তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, গোতাবায়াকে শ্রীলঙ্কায় ফিরে যেতে বাধ্য করুক মালদ্বীপ। গোটাবায়া এখন সিঙ্গাপুরে যাবার কথা ভাবছেন বলে খবর।

শ্রীলঙ্কায় সেনা পাঠাবে না ভারত

শ্রীলঙ্কার বিপর্যস্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করতে ভারত সেনা পাঠাবে না। একথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে বিদেশমন্ত্রক। বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর বলেন, 'আমরা শ্রীলঙ্কায় সেনা পাঠাচ্ছি না। শ্রীলঙ্কায় এখন যা হচ্ছে সেটা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, ভারত তাতে নাক গলাতে চায় না। ভারত চায় শ্রীলঙ্কা দ্রুত স্বাভাবিক হোক, তার জন্য আমরা সবরকম সাহায্য করব।'

ক্ষমতায় এসেই করছাড়ের বন্যা বইয়ে দেন। যার বিরূপ প্রভাব পড়ে সরকারের আর্থিক নীতিতে এবং বাজেট ঘাটতি পাহাড়প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়। করদাতার সংখ্যা ৩৩.৫ শতাংশ কমে যায়। ভ্যাট কমে যায় ৮ শতাংশ। কর্পোরেট ট্যাক্স ২৮ শতাংশ থেকে কমে হয় ২৪ শতাংশ। রাজাপক্ষ জানতেন রাজস্ব ঘাটতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে কিন্তু তিনি ভাবতেন এটা একটা বিনিয়োগ। এর ফলে সম্পদ বৃদ্ধি পাবে।

বিদেশি ঋণ

শ্রীলঙ্কার বিদেশি ঋণ ২০০৫ সালে ছিল ১১.৩ বিলিয়ন ডলার। ২০২০ সালে তা বেড়ে হয় ৫৬.৩ বিলিয়ন ডলার। ২০১৯ সালে শ্রীলঙ্কার জিডিপি-তে বিদেশি ঋণের পরিমাণ ছিল ৪২ শতাংশ, ২০১১ সালে সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে ১১৯ শতাংশ। ২০২২-র শেষ নাগাদ শ্রীলঙ্কাকে যেখানে ৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ শোধ করতে হবে সেখানে দেশটির বিদেশি মুদ্রাভাণ্ডারে রয়েছে মাত্র ২.৩ বিলিয়ন ডলার।

ঋণের ফাঁদ

হামবানতোতা বন্দরের কথা আগেই বলা হয়েছে। হামবানতোতা বন্দর চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ নামের পরিকল্পনার অঙ্গ। সেই হিসেবেই চীনের মার্চেন্ট পোর্ট হোলডিংস ৯৯ বছরের জন্য বন্দরটি লিজ নিয়েছে। এর জন্য চীন ১.১২ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে শ্রীলঙ্কাকে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই চুক্তি একপেশে। কারণ হামবানতোতা বন্দর পরিচালনায় চায়না মার্চেন্ট পোর্ট হোলডিং কোম্পানির অংশীদারিত্ব ৮০ শতাংশ। শ্রীলঙ্কা পোর্ট অথরিটির অংশীদারিত্ব ২০ শতাংশ।

বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, শ্রীলঙ্কার ক্ষয়িষ্ণু আর্থিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়েই চীন এরকম একটা অমানবিক চুক্তি সম্পাদনা করেছে। একেই ঋণের ফাঁদ বলে অভিহিত করেছেন তারা।

ফরেন রেমিটেন্সের হ্রাস

বিপুল অঙ্কের নোট ছাপিয়ে শ্রীলঙ্কার সরকার চেষ্টা করেছিল ১ ইউ.এস ডলারের মূল্য ২০০ শ্রীলঙ্কান টাকায় বেঁধে রাখতে। কিন্তু ফল হলো উলটো। ১ ডলারের দাম হয়ে গেল ২৪৮ শ্রীলঙ্কান টাকা। ফলে বিদেশে বসবাসকারী শ্রীলঙ্কার নাগরিকেরা নানা বেসরকারি চ্যানেল মারফত টাকা পাঠাতে শুরু করলেন। শ্রীলঙ্কা সরকারের রেমিটেন্স ঘাটতি বেড়ে হলো ৬১ শতাংশ। এই পরিস্থিতি এখনও চলছে। বিশেষজ্ঞরা চলছেন শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। সব থেকে বড়ো কথা তাতে সমস্যা বাড়বে ভারতেরও। ■

দক্ষিণের উপকূলে তামিল শরণার্থীরা

অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কা থেকে তামিল শরণার্থীরা দলে দলে দেশ ছেড়ে চলে আসছেন ভারতের দক্ষিণ উপকূলে। এদেরই একজন ৪১ বছর বয়েসি রানি (নাম পরিবর্তিত) ডেকান ওয়ার্ল্ড পত্রিকার প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন তাদের দুর্দশার কাহিনি। রানিদের পরিবারে মোট সদস্য আটজন। তারা বাড়ি ও জমি বিক্রি করে অন্য একটি পরিবারের সঙ্গে এদেশে চলে এসেছেন। রানি বলেন, 'আমার স্বামী ও ছেলেরা কেউ ওখানে কাজ পাচ্ছে না। প্রতিদিন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। প্রতিদিন আমাদের ২ কেজি চাল লাগে। শ্রীলঙ্কায় চাল এখন ২৫০ শ্রীলঙ্কান টাকা কেজি। রোজ আমাদের ৫০০ টাকা চাই শুধু চাল কেনার জন্য। কোথা থেকে পাব?' দেশ ছাড়ার আতঙ্কের কথা এখনও ভুলতে পারেননি রানি। বেশি দুশ্চিন্তা রুগ্ন ছোটো ছেলেটার জন্য। রানি বলেন, 'আমার ছোটো ছেলের থ্যালাসেমিয়া আছে। ওর জন্য পুষ্টিকর খাবার দরকার। শ্রীলঙ্কায় এখন এসব আশা করাই অন্যায়। আসার সময় খুব ভয় করছিল। শ্রীলঙ্কার পুলিশের চোখে ধরা পড়ে গেলে এত খরচ করে এখানে আসা ব্যর্থ হয়ে যেত।' এখনও পর্যন্ত ৮৫ জন শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতে এসেছেন। খুব বেশি সংখ্যায় শরণার্থীদের ভারতে আসা আটকাতে ভারত ইতিমধ্যেই সীমান্তে কড়া পাহারা বসিয়েছে।

চীনের ফাঁদে পা দিয়ে চোরাবালিতে পাকিস্তান

সত্যপ্রকাশ ন্যায়মূর্তি

ফারুক সালিম

ইমরান খান

দু'মাস হলো পাকিস্তানে ইমরান খান সরকারের পতন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে পদচ্যুত করে মসনদে বসেছেন পিএমএল-এন নেতা শাহবাজ শরিফ। অনেকেই ভেবেছিলেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে ইমরান বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে সেদেশে রাজনৈতিক স্থিরতা ফিরে আসবে। তা যে হওয়ার নয়, পরিষ্কার করে দিয়েছেন তেহরিক-ই-হিন্দ দলনেতা ইমরান খান। ইতিমধ্যে ইসলামাবাদ অভিমুখী লং মার্চ করার হুমকি দিয়ে রেখেছেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক। যার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই রাজনৈতিক অস্থিরতা আগামীদিনে আরও খারাপ পরিস্থিতির ইঙ্গিত করছে। যা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে পাকিস্তানের অর্থনীতিকে।

পাকিস্তানের অর্থনীতি ধীরে ধীরে দেউলিয়া হওয়ার দিকে এগোচ্ছে। পাকিস্তানে বৈদেশিক মুদ্রার ভাঁড়ারে ধস নামছে, খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। ক্রমশ মুখ থুবড়ে পড়ছে পাকিস্তানি রুপি। চলতি অর্থবছরে পাকিস্তানি রুপির দাম হ্রাস পেয়েছে শতকরা ২১.৭২ শতাংশ। ইসলামাবাদের অর্থনীতিবিদ ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক ফারুক সালিম পাকিস্তানের অর্থনীতির শিরে সংক্রান্তি দেখে দেউলিয়া পরিস্থিতি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, ডলারের সাপেক্ষে পাকিস্তানি রুপির দাম রেকর্ড পরিমাণে সর্বনিম্ন। দেশে স্টক এক্সেঞ্জের সূচক আরও ৯০০ পয়েন্ট নেমে গেছে। আর্থিক বাজারে ধস অব্যাহত। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে আস্থা হারিয়ে ফেলছেন বিনিয়োগকারীরা। স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে (এসবিপি) বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ মাত্র ১০.৪৪ বিলিয়ন ডলার অবশিষ্ট রয়েছে। এর মধ্যে চীন, সৌদি আরব ও ইউএই'র ক্যাশ ডিপোজিট লোন রয়েছে ৬ বিলিয়ন ডলার। সোজা কথায় চীনা ড্রাগনের তাঁবেদারি করা পাকিস্তান এখন দেনার দায়ে গলা পর্যন্ত ডুবে রয়েছে।

পাকিস্তানের অর্থনীতির এই দুর্দশা কিন্তু একদিনে হয়নি। এর পিছনে রয়েছে চীনের 'ডেট ট্র্যাপ ডিপ্লোম্যাসি'র ফাঁদ। বিশদে জানতে শ্রীলঙ্কার বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর একটু নজর দেওয়া যাক। শ্রীলঙ্কার দক্ষিণাঞ্চলে হামবানতোতায় গভীর সমুদ্রবন্দরের নিয়ন্ত্রণ এবং তার উন্নয়নের জন্য ২০১৭ সালে ১১০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করে চীন। প্রোজেক্ট শুরুর পর চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ তার জন্য মোটা অঙ্কের ঋণও দেয় শ্রীলঙ্কাকে। অবশ্য সবকিছুই ছিল শর্তাধীন। পরের দিকে দেনার বোঝায় জর্জরিত শ্রীলঙ্কা যখন ঋণ শোধ করতে পারল না, শর্তানুযায়ী সেই হামবানতোতা বন্দরের গোটাটাই তুলে দিতে হলো জিনপিঙের হাতে। ইকনোমিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে দেওয়ার নামে ঋণের ফাঁদ তৈরি করে দ্বীপরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে গ্রাস করল চীনা ড্রাগন।

একইভাবে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য চায়না-পাকিস্তান ইকনোমিক করিডোর (সিপিইসি) প্রোজেক্ট শুরু করেছে চীন। ২০১৩ সালের সূচনায় সিপিইসি প্রোজেক্টের ভ্যালু ছিল ৪৭ বিলিয়ন ডলার। সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৫ সালে পাকিস্তানে সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১২২ টা প্রকল্প অনুমোদন করে সিপিইসি। ২০২১-এ তার মধ্যে মাত্র ৩২টা সম্পূর্ণ হয়েছে। সিপিইসি'র চুক্তিপত্রে বলা হয়েছিল ২০২৫ সালের মধ্যে পাকিস্তানে ম্যানুফ্যাকচারিং ও প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করা হবে। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কোনও সম্ভাবনা এখন দেখা যাচ্ছে না। পাকিস্তানের যা পরিস্থিতি, তাতে আগামী ২০৩০ নাগাদ সিপিইসি প্রোজেক্ট থমকে যাবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। কারণ ২০২০তে সিপিইসি বাবদ পাকিস্তানের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৫.৮ বিলিয়ন ডলার। চলতি অর্থবছরে সেদেশের বিদেশি ঋণ ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝায় ধীরে ধীরে নুয়ে পড়ছে পাকিস্তানের মাথা। চুক্তির সময় চীন বলেছিল, সিপিইসি-র মাধ্যমে ২০২৩ সালে ম্যানুফ্যাকচারিং ও প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রির বিস্তারের ফলে ২.৩ মিলিয়ন কর্মসংস্থান হবে পাকিস্তানে। সেই সম্ভাবনায় জল ঢেলেছে পাকিস্তানের ডুবতে থাকা অর্থনীতি।

পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ছিল চীনের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রেখে যেনতেন প্রকারে ভারতকে চাপে রাখা। সেটা করতে গিয়ে যে নিজেই হাড়িকাঠে গলা দিয়ে বসবে তা টের পায়নি। চীনের সিপিইসি'র যাবতীয় কর্মকাণ্ড ছিল পাকিস্তানের গোয়াদর পোর্টকে কেন্দ্র করে। নিজেদের বাণিজ্যিক সুবিধার জন্য বহুদিন থেকে গোয়াদর পোর্টকে নিশানা করেছিল চীন। কারণ এতদিন বাণিজ্যিক সমুদ্রপথ হিসেবে চীনকে ভারত মহাসাগরের পথ ধরতে হত। যা চীনের কাছে ছিল ঘুরপথ।

সিপিইসিকে সামনে রেখে পাকিস্তানের গোয়াদর পোর্ট তাদের নিয়ন্ত্রণে এলে তারা সোজাপথে ইউরোপ, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে সহজেই বাণিজ্য করতে পারবে। তাতে সময় আর খরচ দুই-ই কমবে। ২০১৯-এ ইমরান খান সরকার গদিতে বসে প্রথমেই গোয়াদর পোর্টে মাছ ধরার লাইসেন্স দেয় চীনা প্রশাসনকে। সে সময় বড়ো বড়ো ফিসিং ট্রলারে মাছ ধরতে শুরু করে চীনা ব্যবসায়ীরা। শি জিনপিং সেই প্রথম স্থানীয় পাকিস্তানিদের মুখের গ্রাস কাড়া শুরু করেছিল, যা আজও অব্যাহত।

বছরখানেক আগে আমেরিকান এজেন্সি একটা স্যাটেলাইট ছবি প্রকাশ করে। যেখানে দেখা গেছে, গোয়াদর পোর্টকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো নৌসেনা ঘাঁটি তৈরি করেছে চীন। যে কায়দায় শ্রীলঙ্কা, লাওসের মতো ছোট দেশগুলোকে ঋণের জালে জড়িয়ে সর্বস্ব গ্রাস করেছে চীন, সেই একই ছকে এবার পাকিস্তানের অন্তর্জলি যাত্রা শুরু হয়েছে। শ্রীলঙ্কা কিংবা লাওসকে দেখে শিক্ষা হয়নি পাকিস্তানের। তারা বুঝতেই পারেনি চীনের ডেট ট্র্যাপ পলিসির ফাঁদে পা দিয়ে ধীরে ধীরে পাঁকে ডুবে যাচ্ছে।

সিপিইসি প্রোজেক্ট চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের আওতায় পড়ে। এর মাধ্যমে ছোট দেশগুলোর ইকনোমিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, রেলওয়ে প্রোজেক্ট, কোস্টাল ট্রান্সপোর্টেশন নেটওয়ার্ক ও এনার্জি সেক্টরের ডেভেলপমেন্ট করার চুক্তি করে চীন। তার জন্য প্রচুর টাকা ঋণও দেয়। শুধু তাই নয় সমস্ত পরিকাঠামো তৈরিতে একমাত্র চীনের কাঁচামালই ব্যবহার করে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলো। এমনকী সেখানে নিয়োগ করতে হয় চীনা ইঞ্জিনিয়ারদেরই। প্রকল্পের মাঝপথে দেখা গেছে অধিকাংশ দেশই বিপুল ঋণের বোঝা টানতে পারেনি। দেশে আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। এমনকী গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে। তাতে চীনের কোনও অসুবিধা হয়নি। বরং তারা তাদের বিনিয়োগের পাওনাগণ্ডা সুদে আসলে বুঝে নেয়। যেমন, ধারের টাকা শোধ করতে না পারায় লাওসের অভ্যন্তরীণ পুরো ইলেকট্রিক গ্রিড সিস্টেম কবজা করে নিয়েছে চীন। পাকিস্তানের এখন যা পরিস্থিতি, তারা যদি চীনের ঋণ না মেটাতে পারে তাহলে তাদের জাতীয় সম্পদগুলোর ওপর অধিকার ফলাবে চীন।

ইতিমধ্যে গোয়াদর পোর্টকে চীনের সিন ঝিয়াং প্রভিন্সের সঙ্গে জুড়ে ফেলেছে সিপিইসি, যার বিরোধিতা করে পথে নেমেছিল পাকিস্তানি নাগরিকরা। কিন্তু সেই বিক্ষোভকে তেমন পাত্তা দেয়নি ইমরান খান সরকার।

পাকিস্তানে উদ্ভূত এই পরিস্থিতির জন্য সেদেশের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা দায়ী করছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে। যেসব প্রতিশ্রুতি সামনে রেখে ইমরানের তেহরিক-ই-হিন্দ ক্ষমতায় এসেছিল, তার মধ্যে প্রধানতম ছিল বিদেশি ঋণের বোঝা থেকে রেহাই দেওয়া। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে মাত্র ৩ বছরে বিদেশ থেকে ৩৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ করেছেন ইমরান, যা বিদেশি ঋণের ক্ষেত্রে সর্বকালীন রেকর্ড। ভারত থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার সময় থেকেই পাকিস্তানের জাতীয় বৃদ্ধি খুব কম। বর্তমানে তা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। পাকিস্তানে এখন অর্থনৈতিক বিপর্যয় চলছে। চারপাশের দেনায় জর্জরিত দেশটা এখন চীনের কাছে ধার করা টাকা দিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের টাকা শোধ করে দেশের দৈন্যদশা ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

২০২১-এ পাকিস্তান সরকারের ফেডেরাল ব্যাংক অব রেভিনিউ'র ডিরেক্টর সৈয়দ শব্বর জাইদি প্রকাশ্যে মন্তব্য করেন, 'পাকিস্তান দেউলিয়া হয়ে গেছে'। তাঁর এই মন্তব্যের পরেই চীন সরকার সিপিইসি-তে গাছাড়া মনোভাব দেখাতে শুরু করেছে। তারা মনে করে পাকিস্তানের ঋণের অঙ্ক মাত্রা ছাড়িয়েছে। তারা দেউলিয়া হওয়ার পথে। সেইসব বিদেশি ধার শোধ করতে যে পাকিস্তান চীনের দেওয়া সিপিইসি'র ঋণের টাকা কাজে লাগাবে তা অনুমান করে ২০২০-র শেষেই অবশিষ্ট পাওনা টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বন্ধ হয়েছে এমএল-২ রেল প্রকল্পের কাজও। সমস্যা শুরু হয়েছিল গত বছরের মার্চে। ২০২০, মার্চ ও ২০২১ সালের মার্চে সিপিইসি'র তরফে দুটো বৈঠক হয়। সেখানে চীন পাকিস্তানের আধিকারিকদের ঋণ পরিশোধ নিয়ে প্রশ্ন করে। জানতে চাওয়া হয়, বিশ্ববাজারে পাকিস্তান যে বিপুল অঙ্কের ধার করেছে তা পরিশোধের রোডম্যাপ কী? এ বিষয়ে সেদিন কোনও দিশা দেখাতে পারেনি ইমরান খান সরকার। তারপরই অর্থ সরবরাহ বন্ধ করে দেয় চীন। ইতিমধ্যে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে ইমরান খান। সরকার বদলের জেরে অর্থনীতির বেহাল দশায় টান পড়ছে গেরস্থের পকেটে। তৈরি হয়েছে গৃহযুদ্ধের আবহ। এই পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞরা পাকিস্তানের আসন্ন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষণার দাবি জানাচ্ছে। সেক্ষেত্রে বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা দেশটার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত মে মাসে ক্ষমতায় আসা জোট সরকার বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ ঘাটতি ঠেকাতে কতটা সফল হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। গত জুন মাসে বেসরকারি ব্যাংকের আমানত ছাড়া পাকিস্তান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঞ্চয় ছিল মাত্র ১০.৩ বিলিয়ন ডলার, যা বড়জোর চার সপ্তাহের আমদানি ব্যয় মেটাতে পারে। এখনকার পরিস্থিতি আরও খারাপ। এই মুহূর্তে বাক্যব্যয় না করে ঘাপটি মেরে রয়েছে চীন। পাকিস্তানের যখন পুরোপুরি শ্রীলঙ্কার মতো গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটার অবস্থা হবে, শি জিনপিঙের চীন খোলস ছেড়ে বেড়িয়ে এসে কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেবে নিজের হিসাব। ■

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের সার্ধশতবর্ষ আবির্ভাব স্মরণোৎসব

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের সার্ধশতবর্ষ আবির্ভাব উপলক্ষ্যে বাগুইহাটির রঘুনাথপুরে শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গনে গত ১০,১১ ও ১২ জুলাই তিনদিন ব্যাপী স্মরণোৎসবের আয়োজন করা হয়। প্রথমদিন সকালে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় এবং বিকেলে 'সার্ধশতবর্ষালোকে প্রেমাবতারী শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব নবদ্বীপের শ্রীশ্রী সমাজবাড়ি আশ্রমের শ্রীমৎ বিশ্বম্ভরদাস বাবাজী, বরানগর শ্রীপাটবাড়ি আশ্রমের শ্রীমৎ গুরুবন্ধু দাস বাবাজী, সল্টলেকের অধ্যাপক অপূর্ব দত্ত, ঢাকা থেকে আগত শ্রীমতী ইতিরানি পোদ্দার এবং ড. অশোক কুমার দাস।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহানাম সম্প্রদায়ের সম্পাদক শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন গৌরাঙ্গ কর্মকার, দেবোত্তম সম্মানিত করেন সভাপতি উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী। এদিনের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মহানাম সম্প্রদায় ও মহানাম সেবক সঙ্ঘের সহ সম্পাদক জ্যোতির্ময় গুহ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মহানাম অঙ্গনের শ্রীমৎ দ্বৈপায়নবন্ধু ব্রহ্মচারী।

দ্বিতীয়দিন ১১ জুলাই ভোর ৫টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী পারায়ণ। বিকেল ৫টায় মুর্শিদাবাদ পাঁচগ্রামের

করেন মহানাম সম্প্রদায়ের সভাপতি শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার বেনিয়াটোলা স্থিত শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ মন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বীরচাঁদ গোস্বামী, স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ মহারাজ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী সংযুক্তানন্দ মহারাজ, লেকটাউন গুরুধামের শ্রীমৎ দিলীপ গোস্বামী, শ্রীধাম নবদ্বীপের মহানাম সম্প্রদায়, শ্রীশ্রীহরিসভা মন্দিরের সহ সভাপতি শ্রীমৎ বিবেকবন্ধু ব্রহ্মচারী, মুর্শিদাবাদের ডাহাপাড়ার শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু ধামের শ্রীমৎ নরহরিদাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তন্ময় ভাট্টাচার্য এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দেওঘর শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রমের শ্রীমৎ বন্ধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীধাম রায় ও শ্রীকৃষ্ণ পাল।

অনুষ্ঠানে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় সাংখ্যতীর্থ, সারস্বত সাধক এবং শ্রীধাম নবদ্বীপের প্রভু জগদ্বন্ধু বিদ্যামন্দির, মহানাম মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ড. কুমারনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়কে। মানপত্র, শীতবস্ত্র, স্মৃতিস্মারক এবং দশহাজার টাকার চেক প্রদান করে তাঁকে উৎপল চক্রবর্তী পদাবলী (বন্ধুলীলা) কীর্তন পরিবেশন করেন। তৃতীয়দিন ১২ জুলাই সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত শ্রীশ্রীচন্দ্রপাত কীর্তন এবং বিকেল ৫টায় হরিনামময় শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু গীতিআলেখ্য পরিবেশিত হয়।। রচনায় শ্রীমান পথিক এবং পরিবেশনায় শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা বসু ও সহশিল্পীবৃন্দ।

লোকপ্রজ্ঞা বোলপুর চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে স্বাধীনতা-৭৫ উদ্‌যাপন

গত ১ জুলাই বোলপুর লোকপ্রজ্ঞা চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে জ্ঞানানন্দ আশ্রমে স্বাধীনতা-৭৫ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রজ্ঞাপ্রবাহ পূর্বক্ষেত্র সংযোজক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক অরবিন্দ দাশ। শ্রীদাশ স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। হুল দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন দেবী টুডু। ডক্টরস ডে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিশ্বভারতীর চিকিৎসক মোহিত সাহা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুকান্ত আওন। শেষে রাষ্ট্র বন্দনা বন্দেমাতরম্ সমবেত কণ্ঠে পরিচালনা করেন অসীম মণ্ডল ও কুঞ্জবিহারী প্রামাণিক।

বহরমপুরে বজরঙ্গ দলের উদ্যোগে নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

গত ২৪ জুন মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর নগরের সৈদাবাদ চারশিব মন্দিরে বজরঙ্গ দলের উদ্যোগে এবং ন্যাশনাল মেডিকোস অর্গানাইজেশনের সহযোগিতায় একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের ৪ জন বিশিষ্ট চিকিৎসক ৫০ জন রোগীর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে পরামর্শ, প্রেসক্রিপশন ও প্রয়োজনীয় ওষুধ দেন। শিবিরে

উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করেছেন বজরঙ্গ দলের ব্রহ্মপুর জেলার সংযোজক গোপীনাথ বেদান্তী মহারাজ, জেলা সুরক্ষা প্রমুখ পিন্টু মণ্ডল, বিভাগ সংযোজক প্রদীপ ঘোষ প্রমুখ।

বড়াবাজার সৎসঙ্গ ভবনে গঙ্গাসমগ্র চিন্তন বৈঠক

গত ২৫-২৬ জুন কলকাতার বড়াবাজারের মালাপাড়া সৎসঙ্গ ভবনে গঙ্গাসমগ্র চিন্তন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ৫০ জন কার্যকর্তা এই চিন্তন বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। গঙ্গাসমগ্রের অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক রামাশিসজী তাঁর বক্তব্যে বলেন গঙ্গানদী দূষণমুক্ত রাখতে মানুষকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এর জন্য স্থানে স্থানে কর্মশালার আয়োজন করতে হবে। অখিল ভারতীয় সম্পাদক ড. আশিস গৌতম বলেন, এই কাজে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলের শ্মশানঘাটে বৈদ্যুতিক চুল্লির জন্য সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন। উপস্থিত ছিলেন বৃজ উপাধ্যায় ও গঙ্গা আরতি প্রমুখ সুবোধ গুপ্তা।

রামপুরহাটে লোকপ্রজ্ঞার স্বাধীনতা-৭৫ উদ্‌যাপন

বীরভূম জেলার রামপুরহাট শহরের বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবনে গত ২৮ জুন দক্ষিণবঙ্গ লোকপ্রজ্ঞার উদ্যোগে স্বাধীনতা-৭৫ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। উপস্থিত ছিলেন তারাপীঠের শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের অধ্যক্ষ স্বামী হংসানন্দ মহারাজ, বিশিষ্ট চিকিৎসব ডাঃ দেবব্রত দাস এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক তথা প্রজ্ঞাপ্রবাহ পূর্বক্ষেত্রের সংযোজক অরবিন্দ দাশ। অনুষ্ঠানের শুরুতে সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারতবিধাতা' কবিতা অর্থাৎ জাতীয় সংগীত 'জনগণমন' সম্পূর্ণ গাওয়া হয়। তারপরে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী পার্থসারথি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বরচিত ' এ মাটি আমার, এ মাটি তোমার' গানটি পরিবেশন করেন। প্রাস্তাবিক বক্তব্য রাখেন ডাঃ দেবব্রত দাস। স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ মন্ত্র পাঠ করেন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক দীপেন পণ্ডিত। 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গানটি পরিবেশন করেন রামপুরহাট নগরের কার্যকর্তা দেবাশিস দাস। অরবিন্দ দাশ স্বাধীনতা-৭৫ বিষয়ে সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। আশীর্বচন প্রদান করেন স্বামী হংসানন্দ মহারাজ। সর্বশেষে পরিমল ঘোষ বন্দে মাতরম্ পরিবেশন করেন। উপস্থিত সকলেই তাঁর সঙ্গে গলা মেলান।

সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে গাজোলে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপন

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে উত্তরের সংস্কার ভারতী মালদা জেলার গাজোল শাখার উদ্যোগে স্থানীয় শান্তি লজে গত ৮ থেকে ১০ জুলাই তিনদিন ব্যাপী এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথমদিন দেশাত্মবোধক গান ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয় দিন বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় । এতে ২৩২ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। তৃতীয়দিন দেশাত্মবোধক নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সমস্ত বিষয়ে মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৪১০ জন। তিনদিনের এই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মালদা শহরের শ্যামল রায়, সজল দত্ত, বিমল পাল, রাজু দাস, শ্রীমতী অতসী বাগচী, শ্রীমতী প্রিয়াসা ভট্টাচার্য, শ্রীমতী লক্ষ্মী সরকার ও শ্রীমতী অনুশ্রী সরকার। অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে গাজোলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় গাজোলের স্বনামধন্য আবৃত্তি প্রশিক্ষক সঞ্জীব সরকারের সংস্থা 'সৃষ্টি'র কথা। ১০ জুলাই সন্ধ্যা ৬টায় শান্তি লজে শুরু হয় পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারিণী গাজোলের আদর্শ বাণী অ্যাকাডেমির কৌশিকী সরকার, উচ্চমাধ্যমিকে অষ্টম স্থানাধিকারী গাজোল হাজী নাকু উচ্চবিদ্যালয়ের প্রিয়াংশু রায় এবং নবম স্থানাধিকারী শুভম কুণ্ডুকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ঘাকশোল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী বৈবস্বানন্দ মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ সংস্কার ভারতীর সভাপতি বিপ্লব দেব, সাধারণ সম্পাদক বিকাশ ভৌমিক এবং মাতৃশক্তি প্রমুখ শুক্লা অধিকারী। এছাড়াও ছিলেন গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেববর্মন, গাজোল ১নং গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান কাজল কুণ্ডু এবং মালদা জেলা সংস্কার ভারতীর সভাপতি পরেশচন্দ্র সরকার। দীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের পর স্বামী বৈবস্বানন্দ মহারাজ আশীর্বচন প্রদান করেন। স্বাধীনতার-৭৫ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন পরেশ চন্দ্র সরকার, বিপ্লব দেব ও বিকাশ ভৌমিক। শেষে প্রতিযোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার ও শংসাপত্র। সমগ্র অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সঞ্চালনা করেন সংস্কার ভারতী মালদা জেলা সমিতির অন্যতম সদস্য সঞ্জীব সরকার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গাজোল চর্চাকেন্দ্রের সংযোজক অশোক মজুমদার।

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের নদীয়া জেলা কার্যকর্তা অভ্যাস বর্গ

গত ১০ জুলাই ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের নদীয়া জেলা কার্যকর্তা অভ্যাস বর্গ অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণনগর শহরের বিবেকানন্দ ভবনে। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের রাজ্য সহ সভাপতি আশিস সরকার এবং বিশিষ্ট উদ্যানবিদ ড. ব্যাসদেব চট্টোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করেন নদীয়া জেলার সহ সভাপতি সুশান্ত মজুমদার। জেলার কল্যাণী, হাঁসখালি, করিমপুর, রানাঘাট, তেহট্ট, নবদ্বীপ, চাকদহ, হরিণঘাটা, চাপড়া প্রভৃতি এলাকা থেকে ৪৩ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ড. চট্টোপাধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বলন করে বর্গের শুভারম্ভ করেন এবং উপস্থিত সকলেই ভারতমাতা, ভগবান বলরাম ও বাপুরাও ঠেংড়ীজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের উদ্দেশ্য, কার্যপদ্ধতি ও সংগঠন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন আশিস সরকার। জৈব পদ্ধতিতে চাষ করার জন্য কীভাবে কৃষকদের উৎসাহিত করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেন ড. ব্যাসদেব চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদিত ফসলই আমাদের বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। ফলচাষ আলোচনায় বিকল্প চাষ হিসেবে মালটা ও ড্রাগন চাষের কথা বলেন। জৈবচাষে সফল হওয়া রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক লক্ষ্মণ প্রামাণিক তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি সকলের সামনে তুলে ধরেন। বর্গ সঞ্চালনা করেন জেলার সহ সভাপতি বিভাস মোদক এবং ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সহ সম্পাদক অর্ণব রায়।

ভ্রম সংশোধন

গত ১১ জুলাই সংখ্যায় ২৯ পৃষ্ঠায় সমাবেশ সমাচারে 'হাওড়ায় অঙ্কন, সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতা' শীর্ষকে ভুলবশত 'সমিতির সভাপতি রথীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী' লেখা হয়েছে। হবে 'রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়'। অনিচ্ছকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

ভারতীয় সংগীত ইতিহাসের এক মহান পুরুষ দক্ষিণ ভারতের ‘ত্যাগরাজ’

দীপক খাঁ

দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর জেলার তিরুভাইয়া নগরে ত্যাগরাজের জন্ম ১৭৬৭ সালের ৪ মে। ছোটোবেলাতেই তাঁর মধ্যে কবি প্রতিভার প্রকাশ দেখা দেয়। তাঁর বাবা যখন ভজন গাইতেন সেই সময় ত্যাগরাজও বাবার সঙ্গে যোগ দিতেন। তাঁর রচিত সেই সময়কার দুটি ভজন গান হলো— ‘নমো নমো রাঘবায়’ ও ‘তব দাসোহম’। এই ভজন গান দুটি পরবর্তীকালে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ত্যাগরাজ ছেলেবেলায় পুজোর ফুল আনার জন্য কিছু দূরে একটি বাগানে যেতেন। সেখানে রাস্তার ধারে সেন্টি বেঙ্কট-রামনাইয়ারের বাড়ি ছিল। রামনাইয়ার ছিলেন তখনকার নামকরা সংগীত গুরু। গভীর মনযোগ সহকারে প্রতিদিন রামনাইয়ারের গান শুনতেন। একদিন ছেলের এই কাণ্ড দেখে পিতা বেঙ্কট রাম-নাইয়ারের উপর ভার দিলেন ছেলের সংগীতশিক্ষা দেবার জন্য। ত্যাগরাজ ১৮ বছর বয়েসে বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রী সুযোগ্যা সহধর্মিণী ছিলেন। সেই যুগে দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর ছিল সংগীত এক উল্লেখযোগ্য চর্চাস্থান। ১৩০০-১৯০০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩০০ বছর তাঞ্জোর সংগীত দুনিয়ায় বিখ্যাত ছিল। তাঞ্জোরের রাজারা সংগীতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজকীয় সম্মানের প্রতি ত্যাগরাজের সামান্যতম আকর্ষণ ছিল না। সবসময়েই ত্যাগরাজের বাড়ি পণ্ডিত, গায়ক ও শিষ্যদের ভিড়ে গমগম করত। তাঁদের কেউ কেউ তাঁর বাড়িতে কয়েক সপ্তাহ, কেউবা কয়েক মাস থেকে যেতেন। এই সমস্ত গুণমুগ্ধদের ভরণপোষণের জন্য তাঁকে সপ্তাহে অন্তত একদিন ভিক্ষা করতে বেরোতে হতো। তাঁর ভিক্ষাবৃত্তি ছিল বড়োই অদ্ভুত। রাস্তা দিয়েই ভজন গাইতে গাইতে হেঁটে যেতেন। তাঁর গানে চারদিকে একটা স্বর্গীয় পরিমণ্ডল সৃষ্টি হতো। তাঞ্জোরের মানুষজন তাদের যার যা সামর্থ্য ছিল সকলে ভক্তিভরে ত্যাগরাজকে দিত।

একদিন হরিদাস নামে এক ব্যক্তি কাঞ্চিপুরম থেকে তাঁকে ৯৬ কোটি রামনাম জপতে বলেন। একে ত্যাগরাজ ঈশ্বরের দেওয়া আদেশ বলেই গণ্য করেন। এরপর থেকে দীর্ঘ ২১ বছর ধরে প্রতিদিন ১ লক্ষ ২৫ হাজার বার করে রামনাম জপ করতেন আর তাঁর স্ত্রীও একই সঙ্গে রামনাম জপতেন। মনের এই অনুভূতি থেকে তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত গান হলো— ‘কানু গোন্টিন’ (আমি দেখা পেয়েছি)। রামচন্দ্রের দর্শন না পেলে তাঁর মন বেদনায় ভরে উঠত। এমন এক মনের অনুভূতি থেকে তিনি রচনা করেছেন— ‘এলা পি দাইয়া রাহু’— তুমি কেন আমার প্রতি সদয় নও। ত্যাগরাজ গানের সঙ্গে বীণা বাজাতেন। এই বীণাটিকে তিনি রোজ পূজা করতেন। গান শেষ হবার পর বীণাটির স্থান হতো পুজোর ঘরে। লোকমুখে প্রচলিত একটি কাহিনি হলো, একবার এক সন্ন্যাসী ত্যাগরাজের বাড়িতে এসে তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কয়েকটি পুঁথি দিয়ে যান। রাতে ত্যাগরাজ স্বপ্নে দেখলেন স্বয়ং দেবর্ষি তার সামনে এনে বলছেন, তোমার গান শুনে তৃপ্ত হয়ে আমি এই পুঁথিগুলি তোমার জন্য রেখে গেলাম। এর থেকে তুমি নতুন পুঁথি রচনা করবে। সেই সমস্ত পুঁথি থেকেই জন্ম হয় ‘স্বরার্ণব’ গ্রন্থটির। ত্যাগরাজ জীবনে যেমন ঈশ্বরের কৃপালাভ করেছিলেন, তেমনি তাঁর জীবন ঈশ্বরের মতোই পবিত্র ছিল। দেখে মনে হতো তিনি পুরাকালের কোনো এক ঋষি। স্থির, শান্ত, সৌম্য। তাঁর ঔদার্যপূর্ণ ব্যবহার তাঁর সান্নিধ্যে আসা সকল মানুষকেই মুগ্ধ করত।

ত্যাগরাজে উদার মহৎ চরিত্রের ধারণা পাওয়া যায় তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনাবলীর মাধ্যমে। ত্যাগরাজের সমসাময়িক ত্রিভুবনম সীতারামাইয়া নামে একজন বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন। সীতারামাইয়ার আনন্দ ভৈরবী রাগ সবথেকে বেশি প্রিয় ছিল। এই রাগের ওপর তিনি বেশ কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন। ত্যাগরাজের শিষ্যরা সীতারামাইয়ার কণ্ঠে আনন্দ ভৈরবী রাগের ওপর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের গুরুকে গিয়ে বলেছিলেন। ত্যাগরাজ একথা শুনে সীতারামাইয়ার কণ্ঠে আনন্দ ভৈরবী শোনার জন্য তাঁর একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। ত্যাগরাজকে দেখে উপস্থিত দর্শকরা তাঁকে মঞ্চে যাবার পথ করে দেয়। সেই সময়

সীতারামাইয়া মঞ্চে আনন্দ ভৈরবী গাইছিলেন। ত্যাগরাজকে দেখে তিনি মঞ্চ থেকে নেমে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েন। 'আপনার মতো সংগীতসাধক যেখানে উপস্থিত সেখানে আমি কেমন করে গাইব।'

ত্যাগরাজ সীতারামাইয়াকে বলেন--- 'তোমার কণ্ঠে আনন্দ ভৈরবী শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি। এমন মধুর সংগীত অনেকদিন শুনিনি।' সীতারামাইয়া ত্যাগরাজকে বলেন— 'আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে'। একথা শুনে ত্যাগরাজ বলেন--- 'তোমার প্রার্থনা আমি আগেই মঞ্জুর করলাম। বল কী তোমার প্রার্থনা।

সীতারামাইয়া বললেন, 'আপনি কোনোদিন আনন্দ ভৈরবী গানে সংগীত রচনা করবেন না। ভবিষ্যতে যদি কেউ কোনোদিন এর কারণ জানতে চায় তবে আপনার সঙ্গে আমার নামটিও উচ্চারিত হবে।' ত্যাগরাজের শিষ্যরা কয়েকজন বেশ রেগে গেলেন। ত্যাগরাজ কিন্তু হাসিমুখেই বললেন, 'তোমার প্রার্থনা আমি মঞ্জুর করব'। এরপর থেকে ত্যাগরাজ কোনোদিনও আনন্দ ভৈরবী রাগে গান রচনা করেননি। এর আগে তিনি ওই রাগের যে সমস্ত গান রচনা করেছিলেন তাও কাউকে শোনাননি বা শেখাননি।

একবার এক গরিব দারোয়ানের শখ হয়েছিল সে ত্যাগরাজের কাছে একটি ভজন শিখবে। কিন্তু দারোয়ানের কণ্ঠস্বর ত্যাগরাজের রচিত গান গাইবার উপযুক্ত ছিল না। তখন অত্যন্ত সহজ একটি গান লিখলেন, 'নী দয়াচে' (তোমার কৃপায়)। ওই গানটি তিনি দারোয়ানকে শিখিয়েছিলেন।

ভালো বীণাবাদক শ্রী কুপ্পায়ার নামে ত্যাগরাজের এক শিষ্য ছিল। একদিন তাঁর খুব ইচ্ছা হলো যে গুরুর বীণাটি বাজাবেন। সেদিন ত্যাগরাজ কোথাও গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে কুপ্পায়ার তাঁর পুজোর ঘরে ঢুকে বীণাটি বাজাতে আরম্ভ করেন এবং বীণায় সুর তোলেন। কিছু সময় পরে ত্যাগরাজ বাড়িতে ফিরে আসেন এবং বীণার অপূর্ব আওয়াজ শুনে অবাক হয়ে যান। তাড়াতাড়ি পুজোর ঘরে ঢুকতেই কুপ্পায়ার বীণা নামিয়ে রেখে ত্যাগরাজের পদতলে লুটিয়ে পড়েন, গুরুদেব আপনার অনুমতি ছাড়া বীণা স্পর্শ করেছি— ক্ষমা করে দিন।

ত্যাগরাজ তাকে ডেকে বললেন, তুমি এত অপূর্ব বীণা বাজাও। অথচ আজ পর্যন্ত আমাকে বলোনি। তুমি আজ থেকে রোজ বীণা বাজাবে। সে যুগের বিখ্যাত কবি নরসিংহ দাস তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন--- 'ত্যাগরাজের মতো রামভক্ত দ্বিতীয় কেউ নেই'।

গোপালকৃষ্ণ ভারতী হলেন তামিল ভাষার একজন প্রখ্যাত গীতিকার। সেই সময় গোপালকৃষ্ণ কয়েকটি মাত্র ভজন রচনা করেছেন। একদিন তিনি বহু পথ পার হয়ে ত্যাগরাজের কাছে আসেন। ত্যাগরাজ অতিথিকে জিজ্ঞেস করেন--- আপনি কোথা থেকে আসছেন? —'মায়াভবন থেকে'। একথা শুনে ত্যাগরাজ বলেন, আপনি গোপালকৃষ্ণ ভারতীকে চেনেন যিনি অপূর্ব সমস্ত ভজন রচনা করেছেন? ত্যাগরাজ তাঁর মতো একজন অনামি শিল্পীকে এমনভাবে সম্মান জানাবেন তা কল্পনাও করতে পারেননি গোপালকৃষ্ণ ভারতী। একবার উপনিষদ ব্রহ্মম নামে এক পণ্ডিত কাঞ্চিপুরম থেকে ত্যাগরাজকে একটি চিঠি লেখেন। —আশীর্বাদ রইল। আমি তোমার পিতার সহপাঠী বন্ধু। অনেকের কাছেই তোমার অসাধারণ সৃষ্টির কথা শুনেছি। তোমাকে দেখার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আমার বয়স একশো বছরের বেশি তাই তিরুভাইয়ারে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করার সামর্থ্য নেই। সেই কারণে তোমাকেই আমার গৃহে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম।

ত্যাগরাজ পিতৃবন্ধুর এই আমন্ত্রণ রাখলেন। শিষ্যদের সঙ্গে কাঞ্চিপুরমে কয়েকদিন কাটিয়ে তিরুপতিতে ফিরে এলেন। সেখানে মন্দির দর্শনের জন্য ৭ মাইল পথ পাহাড়ি চড়াই ভেঙে যেতে হয়। ত্যাগরাজ যখন পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছলেন দেবতার বিগ্রহের সামনে পর্দা পড়ে গিয়েছে। তিনি ওই পর্দাকে মানুষের মনের অহংকারের প্রতিরূপ বলে ভাবলেন। তিনি পর্দার সামনে স্বরচিত ভজন গাইতে আরম্ভ করলেন। 'কেন তুমি পর্দা সরাচ্ছ না।' —এই গানের মধ্যে দেবতাকে দেখার ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে। শোনা যায় গান শেষ হবার পরেই সামনের পর্দা আপনাআপনি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। তাঁর ভ্রমণ সমাপ্ত করে ত্যাগরাজ গৃহাভিমুখে ফিরে চলেছেন। এমন সময় তাঁর এক প্রিয় ভক্ত এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার একটি থলি ত্যাগরাজের অজান্তেই পালকিতে রেখে দিয়েছিল। পথ চলতে চলতে সেই স্বর্ণমুদ্রার থলির কথা জানতে পেরে ত্যাগরাজ বললেন, এই অর্থ রামনবমীর উৎসবে গরিব-দুঃখীদের সেবার্থে ব্যবহার করা হবে।

পথে নাজলাপুরম বলে একটা জায়গা এল। সেখানে ডাকাতের ভীষণ ভয় ছিল। পালকি দেখেই তারা পিছু নিল। শিষ্যরা ভয় পেয়ে ত্যাগরাজকে বলল— গুরুদেব এখন উপায় কী? ওই ১ হাজার স্বর্ণমুদ্রার থলি যে আমাদের কাছে আছে। ত্যাগরাজ স্বর্ণমুদ্রা ডাকাতদলকে দিয়ে দেবার কথা বললেন। এবং বললেন— যাঁর উৎসব তিনিই সেকথা ভাববেন আমরা ভাববার কে? সেই মুহূর্তে ত্যাগরাজ গান গাইতে লাগলেন— হে রাম, তুমি লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের উদ্ধার কর। এমন সময় কোথা থেকে তির বর্ষণ আরম্ভ হলো। ঝাঁকে ঝাঁকে তির বর্ষণ হতে লাগল ডাকাতদলের উপর। ডাকাত দল দেখল তির ধনুক হাতে নিয়ে দুটি ছোটো ছেলে ত্যাগরাজকে রক্ষা করছে। সকালবেলায় ত্যাগরাজ এক মন্দির প্রাঙ্গণে এসে উঠলেন। কিছু হয়তো মনে হলো ডাকাতদলের। তারা তাদের হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে ত্যাগরাজের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কাল রাতের ওই বালক দুটি কে? ত্যাগরাজের মনে হলো বালক দুটি স্বয়ং রাম-লক্ষ্মণ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। তিনি তখন ডাকাতদের নিজের বুকে টেনে নিলেন এবং বললেন— তোমরা অনেক ভাগ্যবান, তোমরা স্বয়ং বালক শ্রীরামের দর্শন লাভ করেছ। ত্যাগরাজের সংস্পর্শে এসে ডাকাতদলের জীবনযাত্রায় বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে বোধহয় আর কারোরই তাঁর মতো এত শিষ্য সমাবেশ ঘটেনি। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে গীতিকার গায়ক হিসেবে খ্যাতিলাভ করে। এই ভাবে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় ত্যাগরাজের সংগীত ধারা গোটা দক্ষিণ ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সকলকে ত্যাগরাজ একইরকম শিক্ষা দিতেন না। তিনি তাঁর শিষ্যদের সামর্থ্য, যোগ্যতা ও প্রতিভা অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন। যদি তাঁর কাছে শিষ্যের উপযুক্ত সংগীত না থাকত তবে তিনি নিজেই গীত রচনা করতেন। তিনি সাধারণত দুজন শিষ্যকে একসঙ্গে শিক্ষা দিতেন। এই সমস্ত গান প্রথমে তিনি কয়েকজন কৃতী ছাত্রকে মুখে মুখে শিখিয়ে দিতেন। তারপর তারা অন্যদের সে গান শেখাত।

ত্যাগরাজের শ্রেষ্ঠ ৩০ জন ছাত্রের মধ্যে বেঙ্কটরমণ ছিল একজন। ত্যাগরাজের সমস্ত গীতকে বেঙ্কটরমণই লিপিবদ্ধ করেন। ত্যাগরাজ দেহ রেখেছিলেন আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর অগে। তবুও তাঁর সংগীত লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে আজও অমর। তার সংগীত ভারতীয় সনাতন আত্মাকে আপামর মানুষের কাছে তুলে ধরেছে। আজও তাঁর রচিত সংগীত মানুষকে আপ্লুত করে এক অন্য জগতে নিয়ে যায়। □

নিবেদিতা চেয়েছিলেন ভারতের প্রতীক হোক বজ্র

নিমাই কুমার মুখার্জী

কেউ বলেছেন লোকমাতা, কেউ ভগিনী, কেউ বা বান্ধবী; কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে সর্বার্থক, সর্বসার্থক করেছেন তাঁর বিখ্যাত আশীর্বাণীতে—

'...ভবিষ্যৎ ভারতের সন্তানের তরে,
সেবিকা, বান্ধবী, মাতা তুমি একাধারে।'

ভগিনী নিবেদিতা কীভাবে ভারতের স্বাধীনতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন বা স্বাধীনতা সংগ্রামী ও অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা তাঁর দ্বারা কীভাবে স্বরাজের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, একথা আলোচনার আগে আমাদের জানতে হবে নিবেদিতাকে পাশ্চাত্য থেকে এদেশে আনার পিছনে কী চিন্তা ছিল স্বামীজীর। স্বামী বিবেকানন্দ ইতিপূর্বে সমগ্র ভারত পরিক্রমা করে ভারতের অবনতির দুটো মুখ্য কারণ নির্ধারণ করেছিলেন— এক, ভারতবাসীর সীমাহীন দারিদ্র্য, দ্বিতীয়, চরম অশিক্ষা। তখন ভারতীয় অভিজাত ও ধনী পরিবারের মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুরুষ শিক্ষালাভের সুযোগ পেত— নারীরা নৈব নৈব চ। ভাগ্নে হৃদয় মামি সারদাদেবীর হাত থেকে প্রথমভাগ কেড়ে নিয়েছিলেন এই বলে, 'নারীরা শিক্ষিতা হলে স্বৈরাচারী হবে এবং দেশ উচ্ছন্নে যাবে'। ঘোর কুপ্রথায় আচ্ছন্ন গোটা দেশ ও জাতি। তারই সুযোগ নিয়ে ইতিপূর্বে শক্, হুণ, পাঠান, মোগল দেশকে দাবিয়ে রাখে বেশ কয়েকশো বছর। শেষ পেরেক পুঁতল ইংরেজ। শিক্ষার নামে জাতির মেরুদণ্ড, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সব ভুলিয়ে দিয়ে তাদের কার্যসিদ্ধির জন্য কেরানি তৈরির শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করল।

স্বামীজী অন্তর দিয়ে এসব অনুধাবন করলেন এবং নারী শিক্ষা বিস্তারে কুপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একজন প্রকৃত সিংহিনীকে পাশ্চাত্য থেকে বেছে আনলেন— তিনি হলেন আইরিশ মহিলা মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল— এদেশে এসে হলেন ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর কুলপরিচয়েই ছিল তাঁর বিপ্লবপ্রীতি, বিপ্লবী চরিত্র ও স্বাধীনতাপ্রিয়তার বীজ। তাঁর ধমনীতে ছিল কেল্টিক রক্ত যা বরাবর ইংরেজ- বিরোধী। লন্ডনে বিদগ্ধ মহলে প্রতিষ্ঠিত একজন শিক্ষাব্রতী, বাগ্মী, সৎ ও সাহসী, দক্ষ ব্যক্তিত্ব। তাঁর গড়ে তোলা সিসেম ক্লাবে বার্নার্ড শ ও হাক্সলির মতো বিশ্বখ্যাত লেখক ও বিজ্ঞানী আসতেন। এমন উপযুক্ত আধার ক'জনেরই-বা আছে। স্বামীজীর জহুরির চোখ মার্গারেটকে চিনতে ভুল করেনি।

মার্গারেট সমস্ত অসুবিধা, বাধা, কষ্টের কথা জেনেই এ দেশের মাটিতে পা রেখেছিলেন। স্বামীজীর কাছে ভারতকে ভালোবাসার মন্ত্র পেয়ে তা দিনরাত জপ করেছেন। এদেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, দেব-দেবী ও পরম্পরাতে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। তাঁর চরিত্র অন্য ধাতুতে গড়া। শুধুমাত্র জপ ধ্যান নয়, স্বামীজী প্রদর্শিত অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে গভীর আস্থা রেখেছেন। 'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়'—স্বামীজীর এই দর্শন তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। স্বামীজীর আহ্বানে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে কলকাতার বস্তিতে প্লেগ রোগীদের সেবা করেছেন— রাস্তাঘাট, নর্দমা পরিষ্কার করেছেন। তাঁকে দেখে এদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও যুবকেরা এই সেবাযজ্ঞে শামিল হয়েছেন।

স্বামীজীর অকালপ্রয়াণ তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করলেও এদেশকে সেবা ও ভালোবাসায় তাঁর কোনো খামতি ছিল না। স্বামীজীর আকস্মিক প্রয়াণ নিবেদিতাকে নতুন করে অনিশ্চয়তার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। শুধুমাত্র স্ত্রীশিক্ষার গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে সমগ্র ভারতে জাতীয় চেতনা জাগরণের কাজে আত্মনিয়োগ করতে মনস্থ করেন। তাঁর কাছে এদেশের স্বাধীনতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন মনে হয়েছিল। তাই তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সংযোগ ছিন্ন করার মতো বেদনাদায়ক সিদ্ধান্ত নিতেও পিছপা হননি। কারণ স্বামীজীর অভিপ্রায় ছিল 'রামকৃষ্ণ মিশন' যেন প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না হয়। কিন্তু

স্বামীজী নিজের দেশকে স্বাধীন দেখতে চেয়েছিলেন এবং ১৮৯৭ সলে মাদ্রাজ থেকে দেশবাসীর উদ্দেশে এই আহ্বান জানান, 'আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোনো ক্ষতি নাই।' অদ্ভুত সমাপতন আমরা লক্ষ্য করি, ঠিক এর পঞ্চাশ বছর পর ১৯৪৭ সালে এদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ঋষির দৃষ্টি অব্যর্থ। যে কোনো বন্ধন স্বামীজীর অসহ্য ছিল— তিনি ছিলেন মুক্তির পূজারি। নিবেদিতা সেটা ভালোভাবে জানতেন। তাই তাঁর মনে হয়েছিল গুরুর অসমাপ্ত কাজের ভার তাঁরই হাতে অর্পিত হয়েছে।

১৯০২-এর মাঝামাঝি তিনি ভারত জুড়ে বক্তৃতা সফরে বের হন। উদ্দেশ্য ছিল, স্বামীজীর অগ্নিময়ী বাণীর স্পর্শে দেশের মানুষের মধ্যে জাতীয় মুক্তির চেতনা জাগিয়ে তোলা। এই সময়েই বরোদায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয় অরবিন্দ ঘোষের। অল্প পরিচয়েই দুজনের মনের সঠিক মিল হয় এবং একে অপরকে বিপ্লব ও দেশাত্মবোধে জারিত করে। নিবেদিতা অরবিন্দকে বাঙ্গলায় এসে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনার অনুরোধ জানান। অরবিন্দের কথামতো যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নিবেদিতাকে নিয়ে একটি গুপ্ত রাজনৈতিক কমিটি গঠিত হয়। নিবেদিতা এই আন্দোলনের প্রচারের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। এই কমিটি ইতিমধ্যেই বাঙ্গলার বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা বহু বিপ্লবী সংগঠন ও তাদের প্রায় হাজার দশেক সদস্যের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার দায়িত্ব নেয়।

এর কিছুদিন পরে নিবেদিতা অরবিন্দের সঙ্গে তরুণ বিপ্লবীদের সংগঠিত করতে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন স্থানে উদ্দীপনাময় বক্তৃতা দেওয়া, চিঠিপত্র, প্রবন্ধাদি লেখা, অর্থ সাহায্য করা, জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী বই উপহার দেওয়া, ব্যক্তিগত পরিচয়সূত্রে সরকারের উঁচু মহল থেকে কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ খবর সংগ্রহ করে বিপ্লবীদের কাছে পাঠানো ইত্যাদি বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে গভীর আত্মনিয়োগ করেন। এজন্য তাঁকে বিস্তর ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। তাঁর বাড়ি, তাঁর লেখা চিঠি— সবের উপর পুলিশি নজরদারি চলত। এক সময় তাঁকে গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা থাকায় প্রায় দুবছরের মতো তাঁকে বিদেশে কাটাতে হয়। এমনকী আত্মপরিচয় গোপন রাখার জন্য তাঁকে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয় এবং চিঠিপত্রে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করতে হয়।

পরবর্তীকালে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে চরম ও নরম পন্থীদের সঙ্গে সংহতি সাধনে সাহায্য করেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, মনমোহন বসুর মতো নরমপন্থী, আবার লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ চরমপন্থী— সকলেই ব্যক্তিগত ভাবে নিবেদিতার গুণমুগ্ধ ছিলেন। বিবদমান রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি তাঁর উপদেশ ছিল— প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি করতেই হয় তবে আত্মোৎসর্গীকৃত সেবার মধ্য দিয়ে প্রাপ্তব্য সম্মাননীয় দেশব্রতীর সিংহাসন লাভের জন্য তা হোক, তা যেন ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর সংকীর্ণ স্বার্থপূরণের জন্য সংঘাতে পরিণত না হয়।

নিবেদিতার রাজনৈতিক ভাবনা ও কর্মকাণ্ডের আর এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরার পুনরুজ্জীবন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি বিশ শতকের গোড়ায় সারা দেশের প্রথম সারির শিল্পী, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজ বিজ্ঞানী ও সাংবাদিকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তাঁদের ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আপনাপন ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধনে প্রেরণা দেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার; কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুব্রহ্মণ্যভারতী, দীনেশ চন্দ্র সেন; ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ও রাধাকুমুদ মুখার্জি; বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু; সমাজবিজ্ঞানী বিনয়কুমার সরকার এবং সাংবাদিক মতিলাল ঘোষ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ১৬ অক্টোবর 'সর্বভারতীয় দিবসে' কলকাতার রাজপথে ভারতের ঐতিহ্যশালী নগরগুলির ইতিহাস নানা ট্যাবলো-সহকারে উপস্থাপন বা শোভাযাত্রা করে প্রদর্শনের প্রস্তাব করেন নিবেদিতা। বজ্রকে তিনি জাতীয় প্রতীকরূপে কল্পনা করেছিলেন। বলেছিলেন, পতাকা কেবল একটি জাতির প্রাণ ও ইতিহাস থেকে আবির্ভূত হতে পারে। এক চিঠিতে তিনি লেখেন, 'আমি বজ্রকে ভারতের প্রতীক করতে চাই। ওটি বুদ্ধের চিহ্ন। ওটি শিবের ত্রিশূলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।' স্বামীজী নিজেকে বজ্র বলতেন। তদুপরি এটি প্রতিমা নয়, সুতরাং মুসলমানদের পক্ষে এটিকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত হবে না। মা দুর্গা বজ্রকে তাঁর এক হস্তে ধারণ করেন।' দেবতাদের প্রার্থনায় দধীচি আত্মত্যাগ করেছিলেন, যাতে তাঁর অস্থি দিয়ে নির্মিত বজ্রে তাঁরা তাঁদের শত্রু বৃত্রাসুরকে নিধন করতে পারেন। বজ্র তাই আত্মত্যাগের প্রতীক। নিবেদিতা বলেছেন, স্বার্থশূন্য মানুষই বজ্র। ভারতীয় জীবনের সার্থকতা— স্বার্থশূন্যতায় ও আত্মত্যাগে।

বিদেশি, ভারতপ্রাণ, ভারতবন্ধু অনেকে ভারতে এসেছেন, হয়তো কেউ কেউ ভারতে থেকেও গেছেন আজীবন; কিন্তু নিবেদিতার মতো এমনভাবে এ দেশের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ আর একজনকেও ভারতবর্ষ দেখেনি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি নিবেদিতার প্রেরণায় 'ভারতমাতা'র বিখ্যাত চিত্র জাতিকে উপহার দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, 'ভারতবর্ষকে বিদেশি যাঁরা সত্যিই ভালো বেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সব থেকে বড়ো।'

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু যাঁকে নিবেদিতা 'খোকা' বলে ডাকতেন এবং যিনি নিবেদিতার নিকট বিভিন্নভাবে ঋণী, তিনি নিবেদিতার এই আত্মনিবেদন সম্বন্ধে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে গিয়ে লিখেছিলেন : 'দধীচির মতো আত্মবলিদান, উমার মতো তপস্যা, পুরাণে বা কাব্যে যা বর্ণনা শুনেছি— তাঁর জীবনে তা প্রত্যক্ষ করেছি। ঈশ্বরের পাদপদ্মে কল্যাণের জন্য তিনি সর্বতোভাবে নিজেকে নিবেদন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নাম ঠিক রেখেছিলেন— নিবেদিতা।' □

সারগাছিতে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্নপূর্ণারূপে অধিষ্ঠান

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের মতো তাঁর গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দও বিখ্যাত পুরুষ। তিনিই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে সেবাধর্মের সূচনা করেন। ১৮৯৭ সালে মুর্শিদাবাদের সারগাছি-মহুলা অঞ্চলে তিনি স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম শাখা। হিমালয়ে যাওয়ার পথে সেখানকার দুর্ভিক্ষ দেখে সেখানেই থেকে যান এবং সেবাকাজ শুরু করেন। এক অন্নপূর্ণা পূজার দিন সারগাছিতে সেবাব্রতের সূচনা হয়েছিল, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্নপূর্ণারূপে অধিষ্ঠান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর একদম শেষভাগ। স্বামী অখণ্ডানন্দ বা দণ্ডীবাবা তখন বাঙ্গলার গ্রামাঞ্চলে পরিব্রজনরত। মুর্শিদাবাদের গোটা এলাকায় তখন দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস। সেদিন মহুলা থেকে বহরমপুর চলে যাবেন ঠিক করেছেন। সকালে অশরীরী বাণী শুনলেন, 'কোথায় যাবি? তোর এখানে ঢের কাজ আছে। গঙ্গাতীর। ব্রাহ্মণের গ্রাম, সুভিক্ষস্থান। তোকে এখানে থাকতে হবে!' সেদিন ভাবতা স্কুলের পণ্ডিত এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। এমন

ফঃ ৫

সময় জনৈক রজনী সান্যাল তাঁকে মহুলা গ্রামে খুড়োমশাই সূর্য সান্যালের বাড়িতে মায়ের প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ করলেন। ঘোর অন্নকষ্টের দিনে মা অন্নপূর্ণা পূজার সুসংবাদ তাঁর হৃদয়ে ভাবান্তর ঘটালো। 'স্মৃতিকথা'-য় তিনি লিখছেন, এই শুভদিন পথ হঁটিতে হাঁটিতে কাটিয়া গেলে আমার পরিতাপের সীমা থাকিত না। এই ভীষণ অন্নকষ্টের দিনে নিরন্ন ও দুঃস্থ জনসধারণের অন্নকষ্ট দূর করিবার জন্যই কি মা অন্নপূর্ণা আমাকে এখানে ধরিয়া রাখিলেন? প্রাণে প্রাণে আমি ইহা বিলক্ষণরূপেই অনুভব করিলাম এবং মনে মনে মাকে বলিলাম, এইবার তোমার সঙ্গেই আমার বোঝাপড়া হইবে।' সিদ্ধান্ত নিলেন এখানেই আশ্রমের কাজ স্থায়ীভাবে পরিচালনা করবেন। দুর্ভিক্ষের কাজ সাধ্য মতো সম্পন্নও হলো।

পক্ষাধিককালে থাকার পর চিঠিতে দুর্ভিক্ষের ক্রমাগত বর্ণনা দিলেন স্বামী প্রেমানন্দকে। লিখলেন, দুর্ভিক্ষ-পীড়িতগণের সেবা না করে এখান থেকে তাঁর যাওয়া হবে না। দার্জিলিং থেকে ফিরে স্বামীজী সেই চিঠি পড়লেন। উৎসাহিত করে টাকা আর দু'জন সেবককে মহুলায় পাঠালেন। বললেন, চুটিয়ে কাজ করে যেতে হবে। অখণ্ডানন্দজী তাই করলেন। প্রথম ১৪/১৫ বছর পরগৃহে আশ্রম পরিচালিত হলেও, পরে আশ্রমের জন্য নিজের জমি কেনা হয়। সেখানেই বর্তমান আশ্রমটি গড়ে উঠেছে সারগাছি স্টেশনের অদূরে।

একটি চিঠিতে বিরজানন্দজীকে তিনি লিখছেন, '১৩০৩ সালের শুভ অন্নপূর্ণা পূজার দিন ঠাকুর এখানে আমাকে রেখে তাঁর 'অন্নছত্র' খুলিয়াছিলেন— ঠাকুর এই আশ্রমে আমাদের মা অন্নপূর্ণা।' ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে) অন্নপূর্ণা পূজার দিনে এখানে ইস্টকনির্মিত দ্বিতল দেবালয়ে ঠাকুরের অধিষ্ঠান হয়। আশ্রমের মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনি আরও লিখেছেন, 'আমার অন্তরে ঠাকুর জানিয়ে দেন যে, তিনি এখানে ব্যষ্টিরূপে অন্নপূর্ণা। তাই... কী আশ্চর্য শ্রীমন্দিরের সকল কার্য ঠিক সেই অন্নপূর্ণা পূজার পূর্বদিনেই শেষ হলো।'

১৯১৩ সালের মাঝামাঝি সারগাছি স্টেশনের অদূরে স্থাপন করলেন স্থায়ী আবাস। উলুখড়ে ভরা জমিটি তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সবুজ বাগান ও কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হলো। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের সেবা করতে এসে তৈরি করলেন এক স্বর্গীয় অন্নসত্র। সেই প্রতিষ্ঠান আজ কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে।

জমি কেনার পর দণ্ডী মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ সারগাছি অঞ্চলে এই নামে পরিচিত ছিলেন) তার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশটিকে প্রথমে চাষ-আবাদ করতে উদ্যোগী হলেন। উদ্যোগী হলেন পুষ্পোদ্যান সাজাতেও। প্রাণপ্রিয় গুরুভাই স্বামী বিবেকানন্দ যেহেতু গোলাপ পছন্দ করতেন তাই নানান রঙের গোলাপের বাগান তৈরি করে ফেললেন। আবাসিক অনাথ ছাত্রদের নিয়ে তৈরি করলেন সবজি বাগান। স্থায়ী জমি তৈরি হবার আগে যে যে জায়গায় ছিলেন সেখানেও উদ্যান রচনা করিয়েছেন।

১৮৯৮ সালে তাঁর মনের ইচ্ছা প্রমদা দাস মিত্রকে চিঠিতে লিখেছেন, 'আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, এই অনাথ আশ্রমটি সেলফ্ সাপোর্টিং হয়। অনাথ বালকদিগের দ্বারা উত্তমরূপে আবাদ করাইতে পারিলেই, আশ্রমস্থ বালকগণের শ্রমলব্ধ ধনেই আশ্রমের ব্যয় নির্বাহ হইতে পারিবে।' তিনি অনাথ বালকদের পড়াশোনার পাশাপাশি দর্জির কাজ ও কাপড় বানানোর কাজ শিখিয়েছিলেন। ১৮৯৮ সালে আশ্রমে মোট ১১ জন অনাথ বালক ছিল।

সারগাছি মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দের লেখা ৬৫০টি চিঠি অনুধ্যান করলে দেখা যায় তিনি আশ্রমের কাজকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিতেন। বেলুড় মঠের নির্দেশিত কাজকর্ম ছাড়া তিনি আশ্রম ছেড়ে থাকতে চাইতেন না। এমনকী তিনি কৃষি মরশুমে মনোরম তীর্থক্ষেত্র ও নিসর্গ-নিবিড় ভ্রমণের অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করেছেন। এলাকায় কৃষির উন্নয়নের জন্যও তিনি সক্রিয় থাকতেন। ছায়াবাজি বা ম্যাজিক লণ্ঠনের মতো ভিস্যুয়াল স্লাইড তৈরি করে আধুনিক কৃষিকাজে কৃষকদের সচেতন করতেন। আজকের বেলডাঙ্গা, ভাবতা, সারগাছি, বলরামপুর অঞ্চলে সবজি, পাট ও তৈলবীজ চাষের যে ব্যাপক বিস্তার তার অনুপ্রেরণা স্বামী অখণ্ডানন্দ।

তাঁর চিঠিপত্র পড়ে দেখা যায়, আশ্রমে চাষের জন্য তিনি মায়াবতী থেকে বড়ো জাতের কুমড়া, বরবটি ও শিমের বীজ, তৎকালীন পূর্ববঙ্গের আমিনপুর ও ঢাকা থেকে ভালো জাতের ওলের বীজ, গোয়ালন্দ থেকে তরমুজের বীজ, কলকাতার নার্সারি থেকে তরমুজ, বিট, শালগমের বীজ এবং ময়মনসিংহ থেকে বেগুনের বীজ আনিয়েছিলেন।

এক সময় রাজ্য কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক হিসেবে আমার পোস্টিং ছিল বহরমপুর ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের বেলডাঙ্গা উপগবেষণা কেন্দ্রে। সেসময় সারগাছি মিশনের প্রধান ছিলেন স্বামী অনময়ানন্দজী মহারাজ। তার সম্মতিতে আমি সারগাছি আশ্রমে থাকার সুযোগ পাই। তখন আশ্রমের বালকদের পড়াতাম ও কৃষিকাজ দেখাশোনা করতাম। প্রায় এক বছর সেখানে থেকে আশ্রমের দিব্য পরিবেশ লাভের ও গ্রামবাসীদের কৃষি-কৃষ্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাই। সারগাছি তপোবনে বসবাস আমার এ জীবনের একটি স্মরণীয় তপস্যাকাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ ও মঠাধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দের নাম জানতে পেরেছিলেন মারাঠী যুবক মাধবরাও সদাশিব গোলওয়ালকর, যিনি পরে গুরুজী নামে পরিচিত হয়েছিলেন। উচ্চশিক্ষিত গোলওয়ালকর নাগপুর মিশনে নিয়মিত আসতেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো যুবক ব্রহ্মচারী আনন্দচৈতন্যের (অমিতাভ মহারাজ, সন্ন্যাস নাম স্বামী অমূর্তানন্দ)। তিনি ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত সারগাছিতে স্বামী অখণ্ডানন্দের সেবক ছিলেন, ১৯২৭ সালে নাগপুর আশ্রমে যান। এই অমিতাভ মহারাজের কাছ থেকে গোলওয়ালকর জানতে পারলেন প্রচার বিমুখ ও অন্তর্মুখী সাধু তথা ঠাকুর-মা-স্বামীজীর অতি প্রিয়পাত্র 'গঙ্গাধর মহারাজ' (স্বামী অখণ্ডানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম) বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছি গ্রামে অবস্থান করছেন এবং একনিষ্ঠ

সেবাব্রতে নিবৃত আছেন।

১৯৩৬ সালে হিমালয় স্পর্শ করে এই অমিতাভ মহারাজের সঙ্গেই গোলওয়ালকর চললেন সারগাছির সেই পবিত্র গ্রামে। গোলওয়ালকর জেনেছেন, দেবতাত্মা হিমালয়কে পরমেশ্বর জ্ঞানে শ্রদ্ধা করেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। মারাঠি যুবক রঘুবীর ধৌঙ্গরি, যিনি ১৯৩৪ সালে নাগপুরের ধন্তৌলিতে মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ আশ্রমের ছাত্রাবাসে ছিলেন, তিনিও সারগাছি যাত্রায় গোলওয়ালকরের সঙ্গী হলেন। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এই তিন যুবক মিলে শিয়ালদহ হয়ে সারগাছি স্টেশনে নেমে পাকা ধানের ক্ষেত পেরিয়ে আশ্রমে হাজির হলেন। গোলওয়ালকর তখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যবাহ, ইতিমধ্যে সফলভাবে সামলেছেন আকোলাতে অনুষ্ঠিত অধিকারী শিক্ষণ বর্গ; যেমন বক্তব্য তেমনই তাঁর লেখনী। আরও অনেক বড়ো দায়িত্ব গোলওয়ালকরকে দেবেন ভেবে রেখেছেন প্রথম সরসঙ্ঘচালক ডাক্তারজী। কিন্তু বলা নেই, কওয়া নেই বাড়ি থেকে পালিয়ে, ডাক্তারজীকেও না জানিয়ে গোলওয়ালকর ভিড়লেন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ রূপ এক মাস্তুলে, নোঙর ফেললেন সারগাছির পবিত্র আশ্রমে। ডাক্তারজী উদ্বিগ্ন। ২৩ জানুয়ারি, ১৯৩৭ সালে একটি চিঠিতে নাগপুরের সদাশিব থমব্রে-কে স্বামী অখণ্ডানন্দজী জানাচ্ছেন তাদের কুশল সংবাদ, 'Raghuvir, Golwalkar, Amitav are all well here.'

মাধবরাও সদাশিব গোলওয়ালকর যখন সারগাছিতে পৌঁছেছেন তখন স্বামী অখণ্ডানন্দজীর বয়স প্রায় ৭২ বছর। প্রেসার, ডায়াবেটিস- সহ নানান শারীরিক সমস্যায় প্রায় শয্যাগত। সারাজীবন সেবা দিয়ে গেছেন, কারও কাছ থেকে সেবাযত্ন নিতে চাননি। স্বামী গম্ভীরানন্দজী তাই স্বামী অখণ্ডানন্দের জীবনীতে লিখেছেন, 'বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিলেও আজীবন স্বাধীনচেতা স্বামী অখণ্ডানন্দ দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকার কথা ভাবিতেও শিহরিয়া উঠিতেন— তিনি অপরের সেবা করিবেন, সেবা লইবার অধিকার বা অভিপ্রায় তাঁহার নাই। অথচ বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা ও যুবক ভক্তদের আগ্রহ- নিবন্ধন তাঁহাকে শেষ বয়সে বাধ্য হইয়া কিঞ্চিৎ সেবাগ্রহণ করিতেই হইত। আদর্শ ও বাস্তবের এই সংঘর্ষে তিনি ব্যথিতহৃদয়ে অনেক সময় বলিতেন, 'এইসব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমি নিঃসঙ্গ পরিব্রাজকরূপে বিজন দেশে ঘুরে বেড়াব।'

গোলওয়ালকর (যিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘে 'গুরুজী' নামে পরিচিত)-এর আন্তরিক ইচ্ছায় স্বামী অখণ্ডানন্দজী তার সেবা নিতে রাজি হলেন। গুরুজীর জীবনীকার এইচ.ভি. শেষাদ্রি (Shri Guruji Golwalkar— Biography by H.V. Sheshadri, April 18, 2011) লিখেছেন, 'Shri Guruji would daily bathe him, wash his clothes, offer him tea and meals, put him to bed. Often Shri Guruji would sit through the night at his bed-side and serve him. About six months passed in this manner.' স্বামী অখণ্ডানন্দ নিজে একটি চিঠিতে গোলওয়ালকরের সেবাকর্মের উল্লেখ করেছেন, 'অমূল্য (স্বামী শঙ্করানন্দ, ১৮৮০-১৯৬২, রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সপ্তম অধ্যক্ষ) ৮ দিন Infuenza-য় ভুগিয়া কয়দিন পথ্য পাইয়াছে। নাগপুর হইতে একটি ছেলে আসিয়া সকল রকমে তার কত সেবাই না করিতেছে।' (চিঠিটি স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখেছিলেন ১৩ অক্টোবর, সোমবার ১৯৩৬ সালে, প্রাপক ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে যিনি স্বামী নিরাময়ানন্দ (১৯১১-১৯৮৪) নামে পরিচিত হয়েছিলেন এবং উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদক এবং মনসাদ্বীপ, চেরাপুঞ্জি, আসানসোল, যোগোদ্যান ও বোম্বাই মিশনের প্রধান হয়েছিলেন।)।

জানা যায়, বহু মারাঠি যুবককে স্বামী অখণ্ডানন্দজী পত্রে ও সাক্ষাতে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার নিয়মিত খোঁজখবর রাখতেন গোলওয়ালকর। স্বামী অখণ্ডানন্দ নাগপুর মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করেশ্বরানন্দকে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রয়োজনমতো নাগপুরের মারাঠি দেশপ্রেমী যুবকদের মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষতার পরামর্শ দিতে। মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা নিবাসী বিনায়ক চেপে ছিলেন এমনই একজন যুবক, যিনি পরবর্তীকালে স্বামী অকামানন্দ নামে পরিচিত হয়েছিলেন (১৯৩৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর সারগাছিতে অখণ্ডানন্দের কাছে দীক্ষা, পরে স্বামী বিরজানন্দের কাছে সন্ন্যাস নেন; রাঁচী ও কানপুর মিশনের পূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন; সম্প্রতি পরলোকগমন করেন)। এই মারাঠি বিনায়ককে স্বামী অখণ্ডানন্দ 'চাপরে' নামে ডাকতেন। ১৯৩৫ সালের ১৩ আগস্ট একটি চিঠিতে তিনি চাপরে-কে লিখছেন, 'I hope you are taking good care of your health. I can't understand at this distance why you don't have sound sleep. You will do well to consult Bhaskareswarananda.He will surely help you with his general instructions... Don't meditate morning and evening too hard for sometime, till you are free from sleeplessness.' স্বামী অখণ্ডানন্দ এইভাবে মারাঠি দেশপ্রেমী ও মানবপ্রেমিক যুবকদের নয়নের মণি হয়ে উঠেছিলেন, সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক গুরু হয়ে উঠলেন গোলওয়ালকরের, পরবর্তীকালে যিনি স্বয়ংসেবকদের 'গুরুজী'।

স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থে লিখছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে কথোপকথন হচ্ছে গয়ার জমিদার দুর্গাশঙ্কর মুখার্জির। দুর্গাবাবু ঠাকুরকে বলছেন, 'মশাই, যিনি পূর্ণব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর কোথাও অভাব নেই। তিনি সকল স্থানে সর্বদা রয়েছেন। তাঁর আবার অবতার হয় কী করে?' ঠাকুর বললেন, 'দেখ, পূর্ণব্রহ্ম যিনি, তিনি সাক্ষীস্বরূপ। সর্বদা সমভাবে বিরাজমান আছেন। তাঁর শক্তির অবতার। কোথাও দশকলা, কোথাও বারোকলা এবং কোথাও ষোলোকলা। ষোলোকলা শক্তির অবতার যাঁতে হয়, তাঁকেই পূর্ণব্রহ্ম বলে লোকে পুজো করে— যেমন শ্রীকৃষ্ণ।' অখণ্ডানন্দ জানাচ্ছেন ঠাকুর শ্রীরামকে বললেন বারোকলা। মহালয়ার অমাবস্যা তিথিতে ১৮৬৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর (১২৭১ বঙ্গাব্দের ১৫ আশ্বিন) স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের জন্ম কলকাতার আহিরীটোলায়। □

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ভারতের মনীষা

নিলয় সামন্ত

ভারতের প্রথম মহিলা ফুটবলার হিসেবে নজির গড়ার পথে মনীষা কল্যাণ। সাইপ্রাসের আপোলন লেডিসের হয়ে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিষেকের অপেক্ষায় ভারতীয় ফুটবল দলের নতুন তারকা। স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত রেঞ্জার্স এফসিতে তিন বছর আগে বালা দেবী যখন সই করেছিলেন, আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। তাঁর আগে ভারতের কেউ ইউরোপের সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলার সুযোগ পাননি। ২০ বছরের মনীষা ছাপিয়ে গেলেন বালা দেবীকেও। দু' বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেন সাইপ্রাসের লিগ চ্যাম্পিয়ন ক্লাব আপোলনের সঙ্গে। প্রতিশ্রুতিমান এই ফুটবলারের উত্থানের পথ কিন্তু একেবারেই মসৃণ ছিল না। পঞ্জাবের হোসিয়ারপুর জেলার মুগোওয়াল গ্রামে জন্ম মনীষার। ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতেন বলে গ্রামবাসীদের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলেন। জারি হয়েছিল ফুটবল না খেলার ফতোয়াও। দিনের পর দিন কটাক্ষের শিকার হতে হয়েছিল মনীষার পরিবারকে। কিন্তু হার মানেননি তিনি। অপমানের যন্ত্রণা নিয়েই স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন। পাশে পেয়েছিলেন বাবা ও মাকে।

মনীষার ফুটবলার হয়ে ওঠার কাহিনিও কম আকর্ষণীয় নয়। শৈশবে স্বপ্ন ছিল অ্যাথলিট হওয়ার। ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়াতেন। পাশাপাশি বাস্কেটবলও খেলতেন। কিন্তু অষ্টম শ্রেণীতে ওঠার পরেই বদলে যায় তাঁর জীবনের লক্ষ্য। স্কুলের শারীরশিক্ষার শিক্ষক ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার। তিনি কিছুটা জোর করেই মনীষাকে জেলা ফুটবল দলের ট্রায়ালে নিয়ে গিয়েছিলেন। অসাধারণ খেলে জেলা দলে নির্বাচিত হয়ে এত আনন্দ হয়েছিল তাঁর যে, মাঠে দাঁড়িয়েই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ফুটবলার হওয়ার।

কিন্তু মনীষা খেলবেন কার সঙ্গে? গ্রামের কোনও মেয়েই যে ফুটবল খেলে না। তাই ছেলেদের সঙ্গেই শুরু করলেন খেলা। শৈশবের প্রসঙ্গ উঠলেই মনীষা বলেন, 'গ্রামে ছেলেদের সঙ্গে একমাত্র আমিই খেলতাম। আর কোনও মেয়ে ফুটবল খেলত না। আমার খেলা নিয়ে গ্রামবাসীর প্রবল আপত্তি ছিল। ওঁরা আমার বাবা-মায়ের কাছে নালিশও করতেন নিয়মিত। বলতেন, 'ছেলেদের সঙ্গে একা একটি মেয়ের ফুটবল খেলা ঠিক নয়। তোমরা ওকে বারণ করো। ও যদি খেলা চালিয়ে যায়, তাহলে কিন্তু কোনও দিন বিয়ে দিতে পারবে না।' যোগ করেন, 'রাস্তায় বেরোলেই আমাকে নানা রকম কটূক্তি শুনতে হয়েছে দিনের পর দিন। প্রচণ্ড রাগ হতো। কষ্ট হতো। সেই সময় বাবা ও মা উৎসাহ দিতেন। ওদের জন্যই মনের জোর বেড়ে গিয়েছিল। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ফুটবল খেলেই সব অপমানের জবাব দেব।'

শুরু হলো মনীষার জীবনের নতুন অধ্যায়। উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য গ্রামের স্কুল ছাড়েন তিনি। বাড়ি থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে নতুন স্কুলে প্রত্যেক দিন সাইকেল চালিয়ে যেতেন। অল্প দিনের মধ্যেই নজর কেড়ে নেন। ডাক পান কেঙ্কেরে এফসি ও সেতু এফসিতে। সেখান থেকে অনূর্ধ্ব-১৭ ভারতীয় দলে। স্বপ্ন দেখতেন সিনিয়র জাতীয় দলের হয়ে খেলার। গত বছরের ডিসেম্বরে চার দেশীয় প্রতিযোগিতায় ব্রাজিলের বিরুদ্ধে গোল করে আলোড়ন ফেলে দেন রোনাল্ডিনহোর ভক্ত মনীষা। যাঁরা এক সময় মনীষার ফুটবল খেলা বন্ধ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরাই সেদিন ভিড় করেছিলেন মনীষার গ্রামের বাড়িতে। অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ভারতীয় ফুটবলের নতুন তারকার বাবা-মাকে! রবিবার সন্ধ্যাতেও একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি দেখলেন মুগোয়াল গ্রামের বাসিন্দারা।

মনীষার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত আরেক তারকা ফুটবলার বালা দেবীও। অস্ত্রোপচারের পরে এই মুহূর্তে তিনি বেঙ্গালুরুতে রয়েছেন রিহ্যাবের জন্য। বলছিলেন, 'মনীষার জন্য গর্ব হচ্ছে। আগে কেউ বিশ্বাসই করত না যে, আমাদেরও বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা রয়েছে।' যোগ করেন, 'মনীষা ডাক পেয়েছে সাইপ্রাসের ক্লাব আপোলন লেডিসে। ডাংমেই গ্রেসের সঙ্গে চুক্তি করেছে উজবেকিস্তানের এফসি নাসাফ। ভবিষ্যতে ভারতের আরও অনেক মেয়েই বিদেশের ক্লাবে খেলবে।'

আজ মনীষার সাফল্য বালা দেবীকেও উজ্জীবিত করছে আবার বিদেশে খেলার জন্য। ☐

আরব সাগরের গর্ভে চিরতরে বিলীন হয়েছে ভারতের টাইটানিক 'বিজলি'

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ১৮৮৮ সালে ৮ নভেম্বর। বৃহস্পতিবার। গুরজাটের দ্বারকা বন্দর থেকে শেষবারের মতো পাড়ি দিয়েছিল এস এস বৈতর্ণ। গন্তব্য ছিল বম্বে। কিন্তু বম্বে আর পৌঁছানো হয়নি তার। মাঝদরিয়ায় উধাও হয়ে যায় গোটা জাহাজ। অনুমান করা হয় আটশোরও বেশি যাত্রী ছিলেন ওই জাহাজে। আজও তাঁদের কোনো চিহ্ন মেলেনি সমুদ্রগর্ভে। এস এস বৈতর্ণ-এর এই হারিয়ে যাওয়ার রহস্য উদঘাটন হয়নি আজও। রহস্যই বটে! নইলে ১৯১২ সালে উত্তর আটলান্তিক সমুদ্রে ডুবে যাওয়া টাইটানিকের খোঁজ পাওয়া গেলেও, আরব সাগরে তলিয়ে যাওয়া ভারতীয় জাহাজটি আজও অধরা।

ব্রিটেনের গ্লাসগোর গ্র্যাংজমাউথ ডকইয়ার্ড কোম্পানি লিমিটেড ১৮৮২ সালে তাদের প্রথম স্টিমশিপ এসএস বৈতর্ণ তৈরির কাজে হাত দেয়। যার বরাত দিয়েছিল বম্বের শেপার্ড অ্যান্ড কোম্পানি। উত্তর মুম্বাইয়ে বয়ে চলা বৈতর্ণ নদীর নামে জাহাজটির নাম রাখা হয়েছিল। তিনতলা জাহাজটিতে ছিল ২৫টি সুসজ্জিত কেবিন। সে সময়ে ভারতের কোথাও ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলত না। তবে মাত্র কয়েক বছর আগে আবিষ্কৃত ইলেকট্রিক বাল্ব বা বিজলি বাতি দিয়ে সাজনো হয়েছিল জাহাজটিকে। বন্দরে ভিড়লে অনেক সময় শুধুমাত্র জাহাজের আলো দেখতেই ভিড় করত স্থানীয় মানুষ। কালক্রমে এসএস বৈতর্ণের নামই হয়ে গেল 'বিজলি'। সে যুগে ভারতের পশ্চিম উপকূলের সব থেকে আধুনিক জাহাজ ছিল 'বিজলি'। এ জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন হাজি কসম ইব্রাহিম।

অভিশপ্ত ৮ নভেম্বর সকাল থেকেই আকাশের মুখ ছিল ভার। আরব সাগরের মাথার ওপর জমছে ঘন কালো মেঘ। ক্রমশ বাড়ছে বাতাসের তেজ। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন হাজি কসম। বার বার তাকাচ্ছেন আকাশের দিকে। কপালে চিন্তার ভাঁজ। তখন কচ্ছের মাণ্ডবি বন্দর থেকে এক মাইল দূরে আরব সাগরের বুকে নোঙর করে ভাসছিল বিজলি। ধুলো উড়িয়ে একের পর এক গোরুর গাড়ি এসে পৌঁছচ্ছিল মাণ্ডবি বন্দরে। বন্দর থেকে ফেরি বোটে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছিল যাত্রীদের। তাদের মধ্যে অধিকাংশই বরযাত্রীর দল। কিছু ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। আর ব্যবসায়ী। ঘূর্ণিঝড়ে সমুদ্র উত্তাল হতে দেখে অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন বুঝতে পারছিলেন তখন দোতলা সমান ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজডুবি অনিবার্য। তাই ক্যাপ্টেন জাহাজটিকে তীর থেকে আরও দূরে সরিয়ে রাখাকেই সমীচীন মনে করেন। আসলে ওই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হাজি

কসমের পাখির চোখ ছিল তখন পোরবন্দর। সেভাবেই হোক তিনি পোরবন্দরে জাহাজ নোঙর করতে চেয়েছিলেন। তাতে সুরক্ষিত হবে জাহাজ ও যাত্রীরা। অভিজ্ঞ হাজি কসম পাকা হাতে জাহাজ নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন পোরবন্দরে।

বড়ো ধরনের বিপদ আসতে চলেছে। ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে আরব সাগর কীরকম ভয়ংকর হতে পারে তা বিলক্ষণ জানেন হাজি কসম। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা সত্ত্বেও বিজলির যাত্রা স্থগিত করা যায়নি সেদিন। বাধ্য হয়ে ৫২০ জন যাত্রী ও ৩৮ জন কর্মী এবং প্রচুর পণ্য নিয়ে কচ্ছের মাণ্ডবি ছেড়ে বম্বের দিকে রওনা দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন হাজি কসম। মাঝপথেই শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি ও বজ্রপাত। উন্মত্ত ঢেউয়ের ওপর মোচার খোলার মতো দুলছিল বিজলি। ক্যাপ্টেনের অসামান্য দক্ষতায় দুর্যোগ মাথায় নিয়ে সন্ধ্যার মধ্যে দ্বারকা বন্দরে পৌঁছে গিয়েছিল বিজলি। কিছু যাত্রী নেমেছিলেন গন্তব্যস্থলে। বম্বের জন্য উঠেছিলেন আরও ১৯২ যাত্রী। এসএস বৈতর্ণ-এর লগবুক থেকে জানা যায়, সেদিন মোট ৭৫০ জন যাত্রী নিয়ে খারাপ আবহাওয়ার মধ্যেই দ্বারকা বন্দর ছেড়েছিল বিজলি। গন্তব্য বম্বে। দুর্যোগের চোখ রাঙানিতে সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন যাত্রীরা। কিন্তু হাজি কসম তখন নিরুপায়। এই অবস্থায় তীরে হাজাজ নোঙর করা মানে মৃত্যুকেই পরোয়ানা দেওয়া। কারণ তীরের দিকের ঢেউগুলি আরও ভয়ংকর। সাধারণত সৈকতে জাহাজ নিয়ে গেলে তা বালিতে আটকে যাবে। কিন্তু জাহাজ নোঙর করতে পারেননি। মাঝরাতে মৃত্যুরূপী ঘূর্ণিঝড়ের ঝাপটায় আরব সাগরেই হারিয়ে যায় বিজলি।

এসএস বৈতর্ণ সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার ২৪ বছর পর টাইটানিক জাহাজডুবি হয়েছিল আটলান্তিক মহাসাগরে। অনুসন্ধান চালিয়ে ১৩১ বছর পর সমুদ্রের তলদেশ থেকে উদ্ধার হয় টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ। যা নিয়ে আমেরিকার পরিচালক জেমস ক্যামেরন হলিউড ছায়াছবি বানিয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। আজকের প্রজন্ম টাইটানিক ডুবে যাওয়ার নাড়িনক্ষত্র জেনে ফেলেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিজলির অন্তর্ধান নিয়ে তেমন উদ্যোগ দেখা যায়নি। কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে ক্যাপ্টেন কাশেমের বিজলির সলিল সমাধির ইতিহাস। তবে গুজরাটের প্রবীণ মানুষগুলো এখনো ভোলেনি বিজলির করুণ কাহিনি। তারা সুর করে ছড়া কাটে 'হাজি কসম, তারি বিজলিরে মাধ দরিয়া ভেরন থাই'। □

শুশুক রাজার আত্মকথা

আমি শুশুক রাজা। সমুদ্রে থাকি। তোমরা ইংরেজিতে যাকে ডলফিন বলো, আমি তাই। সমুদ্রে আমার সবাই আছে। তোমাদের যেমন মা-বাবা, ভাই-বোন, কাকা-কাকিমা আছেন, আমারও সেরকম সবাই আছেন। সবাইকে নিয়ে আমাদের পরিবার। তোমরা শুনে আবাক হচ্ছে? সত্যিই আমার সবাই আছে। আর আমি এই সমুদ্রের রাজা। যদিও এক বিশাল হাঙ্গর আছে, সমুদ্রের ওদিকটায় থাকে। সেও নিজেকে রাজা বলেই মনে করে। তবে আমরা কেউ-ই তাকে রাজা বলে মনে করি না। কিন্তু মাঝে মাঝে তার তর্জনগর্জন এদিকটায় চলে আসে। তখন আমরা বলি, 'বলুন রাজামশাই, আপনার জন্য কী করতে পারি।' তখন এক্কেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আর কী করা যাবে। না হলে হাঙ্গরমশাই শুধু শুধু আমার বন্ধু ছেটো ছোটো মাছেদের খেয়ে নেবে।

এখন তো আমরা অনেকটাই বড়ো হয়ে গেছি। আমার ছোটোবেলায় একটা দুর্ঘটনা ঘটে। খুব কষ্টের। আজকে তোমাদের সেই ঘটনার কথাই বলবো।

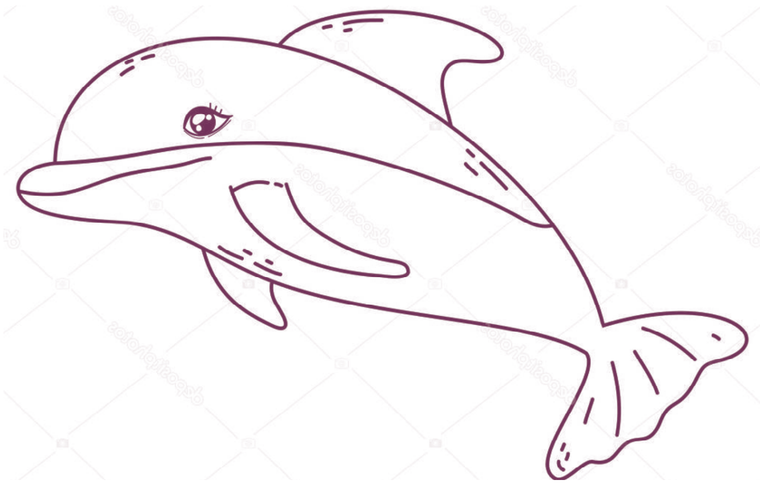

আমি তখন খুব ছোটো। আমরা প্রায় বারো বছর মায়ের সঙ্গে থাকি। আমরাও তোমাদের মতো মায়ের বুকের দুধ খেয়ে বড়ো হই। একবার কী হলো, আমাদের সমুদ্রে এক ভয়ানক ঝড় উঠল। সে এক উথালপাথাল ঝড়। বড়ো বড়ো ঢেউ উঠতে লাগল। আমরা কোথায় কে কোনদিকে ছিটকে গেলাম তার ঠিক নেই। মা, বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব কাউকেই দেখতে পেলাম না। চারিদিকে শুধু অসংখ্য ঢেউ আর ভয়াল ঝড়ের আওয়াজ। একসময় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখলাম, আমি অন্য এক সমুদ্রের পাড়ে পড়ে আছি। কত মানুষ আমার চারিদিকে দাঁড়িয়ে কী যেন বলাবলি করতে লাগল। আমার খুব ভয় করতে লাগল। মা নেই তো আমার পাশে! আমার চেনা জানা লোককেও দেখতে পেলাম না। ভয়ে আমার সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল। আমরা যে সমুদ্রে থাকি সেখানকার অনেক মানুষ আমাদের বন্ধু। এখানে আমাকে ঘিরে থাকা মানুষগুলোর কথা বুঝতে পারছি না। এদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে এরা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। কী করবো ভেবে পাচ্ছি না। এখান থেকে কীভাবে বেঁচে ফিরবো তাও বুঝতে পারছি না।

এমন সময় একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। মনে হলো একটা বাচ্চা ছেলে সমুদ্রে পড়ে গেছে। সবাই দৌড়ে সেদিকে চলে গেল। মা আমাকে সবসময় বলত যে, অপরের উপকার করবে। কেউ নেই দেখে আমি তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের জলে লাফ দিলাম। বাচ্চা ছেলেটি জলে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ওকে ধরে ফেললাম। ততক্ষণে বাচ্চাটি অনেক জল খেয়ে ফেলেছে। ওর শরীর খুব ভারী হয়ে গেছে। আমি ছোট্টো শুশুক। কী করব ভেবে পাচ্ছি না। তবু কোনোভাবে বাচ্চাটাকে টানতে টানতে পাড়ে এনে ফেললাম। বহু মানুষ এসে ভিড় করল। সবাই আমার দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। অনেকে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। তখন আর আমার ভয় করছিল না। আমারও ভালো লাগল যে আমি কত বড়ো কাজ করে ফেলেছি। একজনের কথা বুঝতে পারলাম, সে বলল, 'আরে শুশুক তো মানুষের বন্ধু।' আমার চোখে জল এল। এই মানুষগুলোই একটু আগে আমাকে ধরে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করছিল।

দেখলাম, বাচ্চাটাকে ঘিরে সবাই আনন্দ করছে। সেই ফঁাকে আমি আবার সমুদ্রে লাফ দিলাম। একটু গিয়েই দেখি আমার পরিবার পরিজনরা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমায় দেখে ওরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আমি মাকে সব বললাম। মা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। আর বললেন ভালো কাজের পুরস্কার ঈশ্বর সবসময় দিয়ে থাকেন।

আকাশ দেববর্মণ

ভারতের বিপ্লবী

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস

বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের জন্ম চট্টগ্রামের সারোয়াতলীতে। তাঁর বাবার নাম দুর্গাকৃপা বিশ্বাস। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলের সদস্য হন তিনি। ১৯২৮ সালে জেলার মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাস্টারদা সূর্য সেনের দলের সদস্য হিসেবে ১৯৩০ সালে বোমা তৈরি করার সময় সাংঘাতিকভাবে আহত হন। ১৯৩০ সালের ১ ডিসেম্বর তিনি ও বিপ্লবী কালী চক্রবর্তী চাঁদপুর স্টেশনে ইনসপেক্টর জেনারেল ক্রেগকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলবশত পুলিশ অফিসার তারিণী মুখার্জিকে হত্যা করেন। ২২ মাইল দূরে ধরা পড়েন। ১৯৩১ সালের ৪ আগস্ট বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

জানো কি?

- মানুষের ব্রেন বা মস্তিষ্ক থেকে নার্ভে সেকেন্ডে ১১৭ মাইলেরও বেশি গতিতে তথ্য প্রবাহিত হয়।
- রক্তে মিশ্রিত ২০ শতাংশ অক্সিজেন ব্যবহার করে মস্তিষ্ক।
- মানুষের মস্তিষ্কের দিনের চেয়ে রাতে বেশি সক্রিয় থাকে।
- মস্তিষ্ক ১০ ওয়াট বাল্বের সমপরিমাণ শক্তি উৎপাদন করে
- হৃৎপিণ্ড রক্ত সঞ্চালনের জন্য যে চাপ দেয় তাতে ৩০ ফুট দূরে রক্ত যেতে পারে।
- মানবদেহের সব রক্তনালী জোড়া লাগালে ৬০ হাজার মাইল লম্বা হতে পারে।

ভালো কথা

মায়ের আশীর্বাদ

আমি অক্রুরমণি করোনেশন ইনস্টিটিউশনের ছাত্র। ২০২২-এর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিলাম। মায়ের প্রেরণা ও আশীর্বাদে আমার প্রস্তুতি ভালোই ছিল। আমার মা বেশ কয়েক মাস থেকে ক্যানসার আক্রান্ত ছিলেন। মুম্বাই টাটা মেমোরিয়ালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয়দিন মা আবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে মালদা সদর হাসপাতালে আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। মা আমাকে ছেড়ে চিরতরে চলে যান। বাবা-মায়ের প্রেরণা ও আশীর্বাদে আমার মনোবল ভাঙেনি। মা হারানোর ব্যথা নিয়েই আমি বাকি পরীক্ষা দিই এবং ৬৬৮ নম্বর পেয়ে আমি স্কুলে প্রথম স্থান লাভ করি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে 'ড. বি আর আম্বেদকর মেধা পুরস্কার' দেওয়া হয়েছে। আমার মা এরকমই চেয়েছিলেন। এতে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। আমার পরিবারেরও সবাই আনন্দিত হয়েছে। মাকে আমি কথা দিয়েছি, জীবনে সফল হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবো।

ইন্দ্রনীল কর্মকার, একাদশশ্রেণী, বালিয়াডাঙ্গা,কালিয়াচক, মালদা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ণ ক্ষ প মা রা

(২) ধি রা বি কা চা

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) বি রি ণী প ত্তা

(২) ম মো ন ন হ দ

১১ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) বাড়বাড়ন্ত (২) ভাগ্যবিধাতা

১১ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) হিতাহিতজ্ঞানশূন্য (২) সহায়সম্পদহীন

উত্তরদাতার নাম

(১) শিবাংশী পাণিগ্রাহী, মকদুমপুর, মালদা। (২) শ্রেয়সী ঘোষ, সেকেন্দারপুর, অমৃতি, মালদা। (৩) বৃষ্টি মাহিন্তা, ১ নং গভঃ কলোনি, মালদা। (৪) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

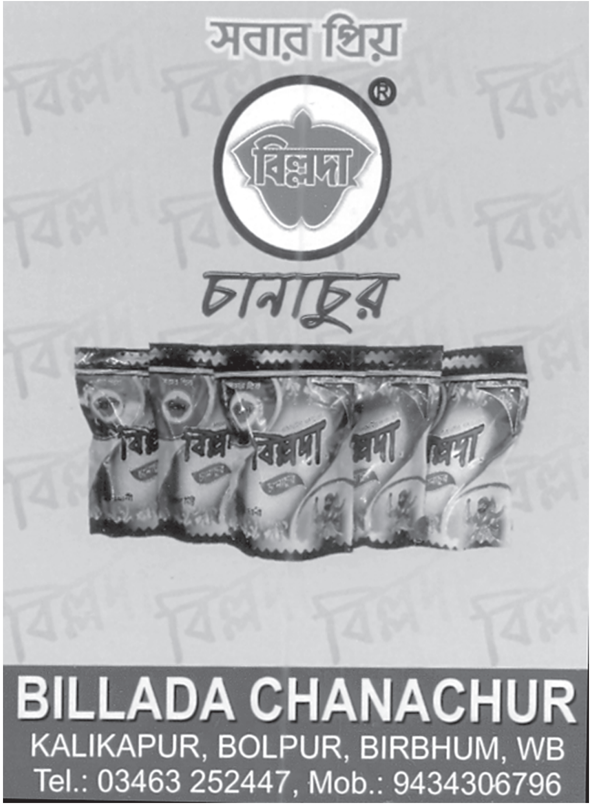

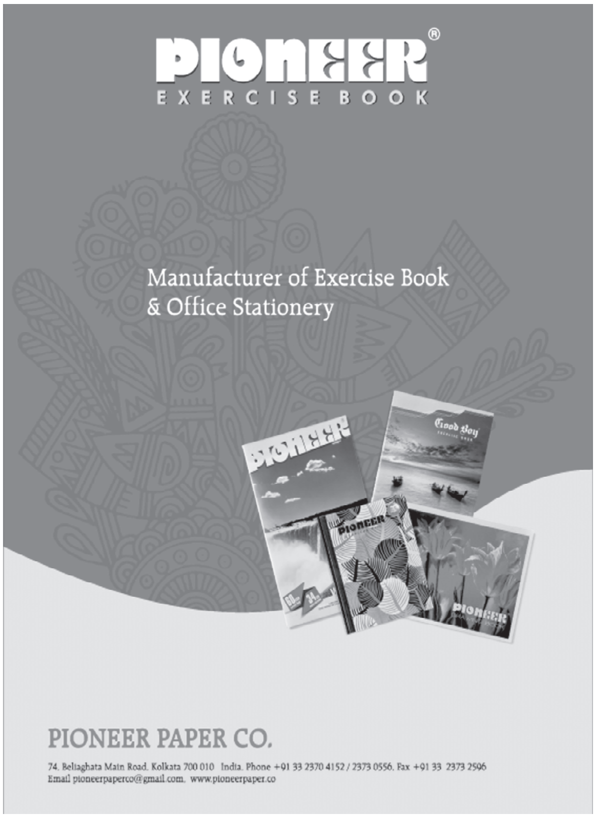

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

অহিংস মহান ধারণা সন্দেহ নেই, কিন্তু স্বাধীনতার জন্য সহিংস পদ্ধতি আরও বেশি মহনীয়

ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি

গান্ধীজী পরিচালিত ব্রিটিশ বিরোধী শেষ সর্বভারতীয় আন্দোলন ছিল ১৯৪২-এর ৮ আগস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলন। আগস্ট আন্দোলন নামেও তা পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান ব্রহ্মদেশ দখল করে ভারতে বিমান হানা চালায়। জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সহযোগিতা প্রাপ্তির আশায় ব্রিটিশ মন্ত্রী স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতে আসেন। কংগ্রেস এ সময় পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করলেও ক্রিপস স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব দেয়। ক্রিপস মিশন কংগ্রেস না চাইলে পরিস্থিতি জটিল হতে থাকে। ১৪ জুলাই, ১৯৪২-তে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস কার্যনির্বাহী সমিতি ইংরেজ সরকারকে ভারত ছাড়ার প্রস্তাব দেয় এবং প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ সংগ্রামেরও কথা বলে। অহিংসার রূপরেখা তৈরি করে ভারত ছাড়ো প্রস্তাব পাশ হয় কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে ৮ আগস্ট, ১৯৪২-এ। 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজী লিখলেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই একমাত্র কাম্য। তিনি বললেন 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। আন্দোলন ঘোষণার দিনই রাত্রিতে কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এলাহাবাদে কংগ্রেসের সদর দপ্তর ব্রিটিশ সরকার দখল করে।

নেতৃত্বহীন এই আন্দোলন দ্রুত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে বোম্বাই, আহমেদাবাদ, পুনা, কলকাতা, ঢাকা প্রভৃতি শহরে আন্দোলন শুরু হলেও পরে গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। বিহার, যুক্তপ্রদেশ, গুজরাট, অসম প্রভৃতি প্রদেশের কৃষকেরা সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশ নেয়। ড. সুমিত সরকার লিখেছেন, 'ঝড়ের চারটি মূল কেন্দ্র ছিল--- বিহার, পূর্ব যুক্তপ্রদেশ, মেদিনীপুর ও ওড়িশা এবং মহারাষ্ট্র-কর্ণাটক।'

১৯৩০ সাল থেকে বিহারে সহজানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে কিষাণ সভা রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। কিষাণ সভার অধিকাংশ সদস্যই ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দেন। এজন্য বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল প্রায় ইংরেজ প্রভাবমুক্ত ছিল। আকাশপথে পাটনা ছাড়া শাসকদের যোগাযোগের কোনো মাধ্যম ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না যে, সহিংসতার কোনো যোগ ছিল কিনা। সহিংসতা গান্ধী মতাদর্শকে উপেক্ষা করেই এই আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার হয়। আন্দোলন যুক্তপ্রদেশ ও পশ্চিম বিহার সন্নিহিত অঞ্চলে শুরু হয়ে ক্রমশ আজমগড়, সারন, বালিয়া ও পূর্ব বিহারের হাজারিবাগে প্রবল আকার ধারণ করে। কৃষকেরা মূলত যুদ্ধংদেহী মনোভাবের পরিচয় দেয়। বালিয়া জেলার দশটি থানা আন্দোলনকারীদের হস্তগত হয়। মধুবনিতে প্রায় পাঁচ হাজার সশস্ত্র জনতা থানা আক্রমণ

ফঃ ৬

করে। সরকারি দমননীতি এই সশস্ত্র আন্দোলনকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মহারাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল গৌরবময়। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্র সবশেষে স্বাধীনতা হারায় বলে স্বাধীনতার আকুতিও ছিল প্রবল। মহারাষ্ট্রে সশস্ত্র বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে। মায়ের অসুস্থতার সময় ছুটির আর্জি বাতিল হওয়ায়, দুর্ভিক্ষে বহু মানুষের মৃত্যু তাঁকে তীব্র ইংরেজ বিরোধী করে তোলে। রামেসিস, কোল, ভিল ও পাঠানদের নিয়ে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের পটভূমি নির্মাণ করেছিলেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে নির্বাসিত করে। যক্ষায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই আত্মত্যাগ আরও বেশি তীব্রতা নিয়ে উপস্থিত হয় বালগঙ্গাধর তিলকের মধ্যে দিয়ে। গণপতি উৎসবকে তিনি সর্বজনীন রূপ দিতে চেয়েছিলেন। মুঘল আগ্রাসনের হাত থেকে মহারাষ্ট্রকে রক্ষাকারী শিবাজী মহারাজের স্মৃতিকে নতুন করে জাগ্রত করার জন্য তিনি 'শিবাজী উৎসব' পালনের ব্যবস্থা করেন। মহারাষ্ট্রের কেশরী পত্রিকায় তিনি যুব সমাজের মনে বিপ্লবের আগুন জ্বালানোর প্রস্তুতি নেন। তিলকের কারণেই মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। দামোদর হরি চাপেকর ও বালকৃষ্ণ হরি চাপেকর নামে দুই ভাই ১৮৯৭-এ পুনার প্লেগ কমিশনার র‍্যান্ড ও আয়র্স্টকে হত্যা করে ফাঁসির মঞ্চে বিপ্লবের জয়গান গেয়ে যান।

বালসমাজ, আর্যবান্ধব সমাজও সশস্ত্র সংগ্রামের সাহায্যে ইংরেজ বিতাড়নে অংশ নেয়। লাহোর, হায়দরাবাদ ইত্যাদি জায়গায় এই সমিতির শাখা খোলা হয়। তিলক, যমুনালাল বাজাজ, ভাই পরমান্দ, লাজপত রায় এবং বাঙ্গলার বিপ্লবীদের সঙ্গে এই সমিতির নিবিড় যোগসূত্র ছিল।

যে কোনো মুক্তিসংগ্রাম দীর্ঘ ঐতিহ্যপুষ্ট ও বহু মতাদর্শের সম্মিলিত প্রয়াস। ৪২-এর আন্দোলনে নেতৃত্বহীনতাকে উপেক্ষা করে জনগণ কেবল ব্রিটিশ বিতাড়নের জন্য মরণপণ করেছিল কেন সে উত্তরের জন্যই আমাদের এই অদূর অতীত যাত্রা। কেননা নাতিদূরে যে সংগ্রামী আন্দোলনগুলো সংঘটিত হচ্ছিল তার এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাব আগস্ট আন্দোলনে এসে পড়বে। যুগ যুগ ধরে বিদেশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে অংশ নেওয়া এ দেশের সংগ্রামী মানুষেরা যে উজ্জ্বল সংগ্রামের ঐতিহ্য বহন করে আসছেন তার যতিহীন যাত্রা অব্যাহত ছিল পরবর্তীকালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনেও। সেই সূত্রেই আমাদের চরমপন্থী পর্বের অভিমুখে এই যাত্রা। এই যাত্রাপথের প্রতিটি স্তরে রয়েছে বিপুল ত্যাগ,আত্মনিবেদন, কৃচ্ছ্রসাধন, বিশ্বাস এবং বিশ্বাস ভঙ্গের নানা কাহিনি। কিন্তু এই রক্তমাখা আত্মনিবেদন ফল্গুধারার মতো প্রবহমান থেকেছে দশকের পর দশক। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন যেমন ধারা, তেমনই রক্তপিচ্ছিল বিপ্লবী শক্তিও এক গতিশীল শক্তিশালী প্রবাহ। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে রক্তস্নাত মনোভাবকে তাই উপেক্ষা করা যায় না। কত বিখ্যাত মানুষই তো নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে বিপ্লবের অনমনীয় মনোভাবকে বেগবতী করেছেন।

এমন একজন মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকর ও তাঁর ভাই গণেশ সাভারকর। দেশের তরুণ সমাজকে দেশপ্রেম ও অস্ত্রশিক্ষা দেওয়ার জন্য 'মিত্রমেলা' নামে একটি গুপ্ত সমিতি (১৮৯৯) তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন যার নানা শাখা মহারাষ্ট্র জুড়ে দেশপ্রেম প্রকাশে ছিল অগ্রণী। আচার্য কৃপালনী, বি.জি.খের প্রমুখ ভবিষ্যতের বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতাদের মনোজগতের ভিত্তিভূমি নির্মাণে এই সমিতির ভূমিকা প্রোজ্জ্বল। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে তাঁদের মতো নেতারা বা তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত নেতারা যখন অংশ নিয়েছিলেন তখন সাভারকরের উজ্জ্বল দেশপ্রেম প্রচ্ছন্ন ভাবে তাঁদের কি প্রভাবিত করেনি? সাভারকর লন্ডনে গিয়ে বোমা তৈরির কৌশল ভারতে পাঠান। তাঁর অনুগামী মদনলাল ধিংড়া ইংল্যান্ডে হত্যা করেন ব্রিটিশ অফিসিয়াল উইলিয়াম কার্জন উইলিকে। সাভারকরের পাঠানো অস্ত্র দিয়েই নাসিকের জেলাশাসক জ্যাকসনকে হত্যা করেন লক্ষ্মণ কানহেরি। এই সব ঘটনায় যুক্ত থাকার জন্য তাঁকে ছাব্বিশ বছর জেলবন্দি হয়ে থাকতে হয়। সাভারকর প্রসঙ্গ আলোচিত হলো এই জন্যই যে বীর সাভারকরের এই আত্মত্যাগ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভারতীয় কিশোর-যুবাদের আলোড়িত করেছে। বিয়াল্লিশের নেতৃত্বহীনতায় ভোগা দিনগুলিতে স্বাধীনতার দুর্মর আকাঙ্ক্ষায় যে তরুণেরা থানা দখল করেছেন, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস সাধন করে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিস্পর্ধী হতে চেয়েছিলেন, তার পেছনেও তো বীর সাভারকর ও অন্য বিপ্লবীদের অবদান ভোলা যাবে না। মনে রাখা দরকার, স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারের প্রচারের বিপুল ঢক্কানিনাদ ও স্ব-মতে ইতিহাস তৈরির বিপজ্জনক ধারণা দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসকে সঠিক ভাবে উপস্থাপিত করেনি। নেহরু-গান্ধী-আজাদের স্তুতিতে নিমগ্ন সেই ইতিহাসে উপেক্ষিত হয়েছেন সাভারকর, নেতাজী, রাসবিহারীর মতো বিপ্লবীরা।

বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে মহারাষ্ট্রে বিপ্লববাদের যে বীজ বুনেছিলেন তা বনস্পতি হয়ে দেখা দেয় বাঙ্গলা ও পঞ্জাবে। লালা হরদয়াল, অজিত সিংহ পঞ্জাবে সশস্ত্র বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। লালা হরদয়াল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যে বয়কট ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন তা পরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত ভারত ছাড়ো আন্দোলনে কি প্রভাব ফেলেনি? এই পরিকল্পনা পরবর্তী আইন অমান্য আন্দোলনকে (১৯৩০) অবশ্যই পথ দেখাতে সাহায্য করে। এর পরের শেষ গণআন্দোলন হলো এগারো বছর পরের ভারত ছাড়ো আন্দোলন। বিপ্লবের ধারা ও ঐতিহ্য দশক অতিক্রমী এই আন্দোলনেও বিপুল প্রভাব ফেলেছিল। মনে পড়ছে তুরস্কের জাতীয়তাবাদী কবি নাজিম হিকমতের বিপ্লবের ঐতিহ্যের প্রতি উচ্চারিত কবিতার পঙ্‌ক্তি—

'I am among men, I love mankind
I love action
I love thought
I love my struggle
Who are a human being inside my struggle my beloved I love you.'

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রাসবিহারী বসুর অবদান অসাধারণ। বড়লাট হার্ডিঞ্জ বা পঞ্জাব পুলিশ কমিশনার জর্ডনকে হত্যার চেষ্টা অথবা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যাপক সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনায় রাসবিহারীর অবদান অবিস্মরণীয়। জাপানে আশ্রয় নেওয়ার সময়ও ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন উপেক্ষিত এই মহানায়ক। রাসবিহারীর এই দুঃসাহসিক আত্মনিবেদন বাঙ্গলা, পঞ্জাবের পরবর্তী আন্দোলনকেও নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রায় এগারো বছর আগে আত্মবলিদান দিয়েছেন ভগৎ সিংহ। সাইমন কমিশন বিরোধী বিক্ষোভের সময় পুলিশের লাঠির আঘাতে লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু হয়। ভগৎ সিংহ এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য লাহোরের পুলিশ সুপার মি. স্যান্ডার্সকে গুলি করে হত্যা করেন। ১৯২৯-এ ভগৎ সিংহ ও বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লির কেন্দ্রীয় আইনসভায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য দোষী সাব্যস্ত হন। ২৩ মার্চ, ১৯৩১-এ তাঁদের ফাঁসি হয়।

ভগৎ সিংহের মৃত্যু অজস্র বিপ্লবীর গৌরবময় আত্মদানের মধ্যে কেবল সীমায়িত ছিল না। তাঁর মৃত্যু দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষকে আবেগমথিত করে। তাঁদের বজ্রকঠিন শপথ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। ভগৎ সিংহ তাঁর আদর্শ ও আত্মত্যাগ নিয়ে যুগান্তরের বিপ্লবের যাত্রী হলেন। ফলে প্রায় দশক পর যখন ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়, তখন তরুণের দলের একাংশ এ ধরনের নিঃশেষে আত্মদানকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েই সশস্ত্র পথও বেছে নেন। ফলে বিহারের পাটনায় আগস্ট আন্দোলনের সময় ১১ আগস্ট মহাকরণে জাতীয় পতাকা তোলাকে কেন্দ্র করে সেনাবাহিনীর হাতে সাত ছাত্রের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু বিদ্রোহের চেতনার রং হয়ে বিহারের সর্বত্র আছড়ে পড়েছিল। উত্তেজিত জনতা সেদিন ঝিম ধরা গান্ধীনীতিকে আঁকড়ে ধরেননি। 'বিদ্রোহ চারিদিকে বিদ্রোহ আজ'। ফলে জায়গায় জায়গায় পথ অবরোধ, রেললাইন ও সেতু ধ্বংস, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে ব্রিটিশ শাসনের ভিত উপড়ে দিতে চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। নেহরু, গান্ধী, আজাদরা কিন্তু কারান্তরালে। কংগ্রেসের বড়ো-মেজো-সেজো নেতাদের অনুপস্থিতিতে এই তীব্র জনরোষের পেছনে পূর্বেকার বিপ্লবী শক্তিই তো ক্রিয়াশীল ছিল।

হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। ১৯৩৯-এর ত্রিপুরি কংগ্রেসে গান্ধীজীর প্রিয় পট্টভী সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হলে অহিংস গান্ধীজীর উক্তি ছিল যে পট্টভীর পরাজয় আসলে তাঁর পরাজয়। অহিংসের পূজারির এমন রক্তপাতহীন সহিংস মনোভাবে স্তব্ধ হয় দেশের প্রতিবাদী শক্তি। পদ ছেড়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। এবং তা ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মাত্র তিন বছর আগে। এ ঘটনা ভারতবর্ষের সর্বত্র বিপুল প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। বাঙ্গলায় সুভাষচন্দ্রের আপোশহীন মনোভাব তীব্র ভাবে জননন্দিত হয়। এর প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না ভারতছাড়ো আন্দোলন। বিপ্লবী শক্তি পথ খুঁজছিল তীব্র ইংরেজ বিরোধী মনোভাব নিয়ে। ১৫ আগস্ট ছাত্র ধর্মঘটের সময় ঢাকায় পাঁচ ছাত্রের মৃত্যু হয় পুলিশের গুলিতে। প্রকৃত ভারত আবিষ্কার করতে গেলে এ ধরনের ঘটনাপ্রবাহের উল্লেখ, আলোচনা জরুরি। নেহরুর অবশ্য এ ধারণার দায় ছিল বলে মনে হয় না।

বাস্তবতার দাবি সামলে গান্ধীজী প্রদর্শিত পথে আন্দোলন অহিংস থাকে না। পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায় বৃহৎ শক্তির পতনের পর যখন নতুন শক্তি আসে তখন সহিংসতাকে উপেক্ষা করা যায় না। এর আগে ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলের সময় যখন পরাধীন দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'Rule! Britania! Rule the waves/Britania never will be slaves'-এই ব্রিটিশ সংগীতকে মিথ্যা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন তখন চৌরাচৌরির পুলিশ চৌকি আক্রমণ ও তৎসঞ্জাত হিংসা এবং বাইশজন পুলিশ কর্মীর মৃত্যু দেখে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। ফলে জাগ্রত এক বিপুল ব্রিটিশ বিরোধী শক্তি সেদিন হতাশ হয়। এই ধরনের হতাশা এক ধরনের চরমপন্থী মতবাদের সৃষ্টি করে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই শক্তির ভূমিকাকে গান্ধীজী সন্ত্রাসবাদ বলে অভিহিত করেছেন। ১৯২৯-এ দিল্লির কেন্দ্রীয় আইনসভায় ভগৎ সিংহ ও বটুকেশ্বর দত্তের বোমা নিক্ষেপ এবং তার পরিণতির কথা আগেই ব্যক্ত হয়েছে। তাঁদের ফাঁসির আদেশ রদ হতো যদি বাপুজী ভাইসরয়কে এ বিষয়ে আবেদন করতেন। তা তিনি করেননি। কারণ তিনি সন্ত্রাসবাদকে, হিংসাকে দূষণীয় মনে করেন স্বাধীনতার যুদ্ধে। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ভারতীয় তরুণদের আহ্বান জানাবেন ব্রিটিশ সরকারের সৈন্যদলে যোগ দিতে। ক্ষেত্র বিশেষে অহিংসা তত্ত্বের এই বহুরূপী ব্যবহার কী চমৎকার!

এই বীর সন্তানদের মৃত্যু দেশের তরুণ রক্তকে বিক্ষুব্ধ করে। ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে চরম মনোভাবাপন্ন শক্তিগুলি অংশ নেয় নিজেদের মতাদর্শকে মাথায় রেখে। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় এই স্পর্ধিত যুবশক্তি নিজের মতো করে পথ তৈরি করতে চায়। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সহিংসতা নানা জায়গায় দেখা দেয় তার পিছনে সক্রিয় থেকেছে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রেরণা। গান্ধীজীর আপোশকামী মনোভাব সর্বত্র গ্রহণীয় ছিল না। একবার গান্ধী কলকাতায় এলে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যে কথপোকথন হয়েছিল তার উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া যাক শচীননন্দন চট্টোপাধ্যায়ের 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' গ্রন্থ থেকে।

'মহাত্মাজী বললেন, Sarat Babu, You have no faith in Charka?

শরচৎন্দ্র বললেন, No, not a jot.

মহাত্মাজী। But you spin better than many lovers of Charka.

শরৎচন্দ্র। I have learnt spinning because I have love for you though not for the Charka.

মহাত্মাজী মৃদু হেসে বললেন, But why don't you believe that the attainment of Swaraj will be helped by spinning?

শরৎচন্দ্রও হেসে বললেন, No, I don't

believe. I think attainment of Swaraj can only be helped by soldiers and not by spiders.'

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম 'ভাঙার গান' বা অন্যান্য অনেক সংগীতে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। বন্দিশালায় আগুন জ্বালিয়ে তাকে উপড়ে ফেলার কথা বলেছিলেন। 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান/ক্ষয় নাই তার নাই'— রবীন্দ্র সৃষ্ট এই মাভৈঃ মন্ত্র তো তখন প্রবল জাগরণী মন্ত্র। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে রৌদ্র রস সৃষ্টিতে তাঁদের সামান্য কিছু আগে সৃষ্ট এই জাতীয় রচনাগুলি প্রবল প্রভাব ফেলেছিল। যদিও সামান্য কিছু আগে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ঘটে ১৯৪১-এ। কবি নজরুল বাক্‌রুদ্ধ হন ১৯৪২-এ।

বিশ শতকের সূচনা লগ্ন থেকেই অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯০৯-এ ডাঃ গারফিল্ড উইলিয়ামস মিশনারিদের এক সম্মেলনে সম সময়ের হতাশাব্যঞ্জক ছবি তুলে ধরেছেন। তাঁর কথায় কারিগর বা মুটে মজুরেরা দিনে বারো আনা থেকে এক টাকা আয় করলেও একজন শিক্ষিত তরুণের সে সময় মাসে তিরিশ টাকা বা কুড়ি টাকার মাস মাইনের চাকরি পেতে প্রাণান্ত হতে হতো। তখনই তাঁর হিসেবে বাঙ্গলায় শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল চল্লিশ হাজার। এই বেরোজগারি তরুণদের একটা অংশ স্বভাবতই ছিল হতাশাগ্রস্ত। এই কর্মহীনতার ধারা স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত খরতর বেগে বহমান ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এদেশে যে অর্থনৈতিক মন্দা আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তা আরও প্রকট হয়। ফলে যুব সম্প্রদায়ের ধ্বংসাত্মক মনোভাবও যুক্ত হয়। ব্রিটিশ শক্তিকে কাঁপিয়ে দিতে আন্দোলনকারীদের সব কিছু ভেঙে দেওয়ার মনোভাব সক্রিয় ছিল। কৃষকদের অবস্থাও ছিল সংকটজনক। ফলে কৃষিকেন্দ্রিক সাধারণ পরিবারের মধ্যেও চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। যার অন্যতম পরিণাম ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় স্পর্ধিত যুবশক্তির আস্ফালন। এই সময় মেদিনীপুর, দিনাজপুর, বালুরঘাট প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষকেরা খাজনা বন্ধ আন্দোলনে যুক্ত হয়।

বিহারের ভাগলপুর, মুজাফ্‌ফরপুর, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগনা কৃষক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়। যুক্ত প্রদেশের হরদই, বরাবাঁকি, রায়বেরিলি, প্রতাপগড় প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষিকেন্দ্রিক মানুষেরাও ব্যাপক হিংসাত্মক আন্দোলনে অংশ নিয়ে ইংরেজশক্তির পতন ঘটাতে চেয়েছিলেন। প্রায় আশি শতাংশ থানা আন্দোলনকারীদের দখলে চলে যায়। গুজরাটের সুরাট, খান্দেশ, ব্রোচ, উড়িষ্যার তালচের-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষকেরা যে আন্দোলন করেন তাতে গান্ধীজীর অহিংস মতাদর্শ যে রক্ষিত হয়নি তা বলাই বাহুল্য। দেশের বিপুল সংখ্যক অন্নদাতা প্রায় নেতৃত্বহীন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে ইংরেজ অধীনতাকে বিপুল চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছিলেন। এদেশে উপনিবেশ যে রক্ষা করা যাবে না এবং তীব্র শক্তিশালী গণ অসন্তোষকে সঙ্গী করে শাসনভার পরিচালনা যে অসম্ভব সেই চরম সত্য ব্রিটিশ শক্তি বুঝেছিলেন।

যে কোনো স্বাধীনতা সংগ্রাম একদিনে সংঘটিত হয় না, তা দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন মতাদর্শের ফল। ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের অন্যতম ক্ষেত্র ছিল বাঙ্গলা, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র। ১৮৫৭-এ বড়লাট ক্যানিং-এর সময় এ দেশের সিপাহি, রাজা-মহারাজা, নবাব ও জনগণের অসন্তোষকে কেন্দ্র করে মহা আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজের যে মোড়কটি দাঁতে কেটে বন্দুকে ভরতে হতো তাতে গোরু ও শূকরের চর্বি মাখানো আছে বলে রটিয়ে দেওয়া হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যারাকপুর সেনানিবাসের ৩৪নং বেঙ্গল আর্মির সিপাহি মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে যে প্রতিরোধ তীব্রতম, হয়েছিল তার গৌরবগাথা দশকের পর দশক সক্রিয় ছিল। এই ধরনের তীব্র সংগ্রাম অনেক পরে সৃষ্টি হওয়ার ভারত ছাড়ো আন্দোলনেও প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল।

৪২-এর আগে বাঙ্গলা, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র— এই তিন রাজ্যে ইংরেজ বিরোধী ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় ঔপনিবেশিক প্রভুদের প্রতি গণমানসের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের কথা। ১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর কার্জন সাহেব প্রশাসনিক সুবিধার নামে বঙ্গভঙ্গ করেন। কার্জনের উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গলাকে দ্বিখণ্ডিত করে জাতীয় আন্দোলন দুর্বল করা। এ জন্য সাম্প্রদায়িক তাস খেলতে চাইলেন তিনি। নবগঠিত পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ সরকারের প্রীতি দেখাতে চেয়েছিলেন তিনি। পূর্ববঙ্গ ও অসম প্রদেশের তিন কোটি জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু ছিল এক কোটি কুড়ি লক্ষ, মুসলমান এক কোটি আশি লক্ষ। বাঙ্গলাকে দ্বিখণ্ডিত করার কারণ সম্পর্কে সমসময়ের স্বরাষ্ট্র সচিব রিজভি বলেছিলেন, 'বাঙ্গলা ঐক্যবদ্ধভাবে বৃহৎ শক্তি। বাঙ্গলাকে বিভক্ত করলে তা নানা অভ্যন্তরীণ সংকটে পর্যুদস্ত হবে।'

ইংরেজ চা-ব্যবসায়ীদের সুযোগ দেওয়াও ছিল অন্যতম লক্ষ্য। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বঙ্গপ্রদেশ হয় সংঘাত চঞ্চল ক্ষেত্র। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনী কুমার দত্ত, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে বোম্বাইয়ের তিলক, যোশী, পরাঞ্জপে, মাদ্রাজের লালা রাজপত রায়, জয়পাল প্রমুখ নেতাও যোগ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গান লিখে রাখিবন্ধনের সূচনা করে জনমানসে বিপুল আলোড়ন তোলেন। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার দিন হাওড়ার বার্ন কোম্পানির বারো হাজার শ্রমিকের সঙ্গে বাঙ্গলার সাঁইত্রিশটি পাটকলের আঠারোটিতে শ্রমিক ধর্মঘট হয়। তীব্র গণআন্দোলনের কারণে ১৯১১-তে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়।

মনে রাখা দরকার, এই আন্দোলনে নেহরুর ভূমিকা অপ্রাসঙ্গিক। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজীর এদেশে প্রত্যাবর্তন হবে আরও চার বছর পর, ১৯১৫-তে। জাতীয়তাবাদী এই আন্দোলনে ব্রিটিশ চক্রান্তকে ব্যর্থ করে সাফল্য পাওয়ার জন্য তখন কিন্তু গান্ধীজী বা নেহরুর ভূমিকা ছিল না। বলার বিষয় এই যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেব গান্ধী ও জওহরলাল নেহরুর নাম একসময় সরকারি মদতে তারস্বরে প্রচার করা হতো। কিন্তু লক্ষণীয় যে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ব্রিটিশ শক্তিকে

স্তব্ধ করেছিল। এই মহান সংগ্রাম দীর্ঘ সময় ধরে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে, ভবিষ্যতের গৌরবগাথা নির্মাণে সহায়ক হয়েছে। ফলে '৪২-এর নেতৃত্বহীন ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় রক্তের মধ্যে থাকা সংগ্রাম ও হার-না-মানা ঐতিহ্য সক্রিয় ছিল। কারারুদ্ধ নেহরু বা গান্ধীজীর আধ্যাত্মিক অসহযোগ স্বভাবতই গুরুত্ব পায়নি বহু ক্ষেত্রে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে 'বয়কট' নীতির সূচনা হয়। বিদেশি দ্রব্য বর্জন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন ইত্যাদির মধ্যে অবশ্যই এক বিপ্লবী শক্তির সূচনা হয়। এই সশস্ত্র আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১৮-তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি। ব্রিটেন ও তার সহযোগীরা অর্থাৎ মিত্র শক্তি জয়লাভ করে। এ সময় মন্টেগু চেমসফোর্ড রিফর্মস নামে যে প্রস্তাব পাশ হয় তা ভারতীয় নেতৃত্বকে হতাশ করে। সম সময়ে প্রবর্তিত রাউলাট অ্যাক্টের নামে চূড়ান্ত দমন পীড়নের অমানবিক ব্যবস্থাকে আইনসম্মত করে ইংরেজ সরকার। ১৯১৯-এর ২৮ মার্চ। পঞ্জাবে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। সৈফুদ্দিন কিচলু ও সত্যপাল গ্রেপ্তার হলে বিক্ষোভ তীব্রতর হয়। ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের তিনদিক ঘেরা ময়দানে জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে নিরস্ত্র মানুষের ওপর গুলি চললে সরকারি হিসেবে ৩৭৯ জনের মৃত্যু হয় এবং দেড় হাজার মানুষ আহত হন। গান্ধীজীর মতো নেতা যখন পঞ্জাবে প্রবেশ করতে অনীহা দেখালেন, তখন নাইট উপাধি ত্যাগ করে জাতির প্রতিবাদ হিসেবে রবি-রশ্মি ছড়ালেন কবিগুরু। এই চরম অন্যায় যে পুঞ্জীভূত মর্মদহন ও বিপ্লবের পটভূমি তৈরি করে তার স্থায়িত্ব বহুদূর ব্যাপ্ত। ৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় দেশব্যাপী সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর হামলা বা সহিংস মনোভাবের পেছনে জালিয়ানওয়ালাবাগের যন্ত্রণাত্মক পরিণতি নিষ্ক্রিয় ছিল না।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন কিংসফোর্ড। হিংস্র মনোভাবের এই উচ্চপদস্থ আমলা মনে করতেন নেটিভরা কোনো কর্মের নয়। হিদেন উদ্ধার কল্পে ইংরেজ অবতারের রূপ যেন গ্রহণ করেছে। অবশ্য শ্বেতদ্বীপের অবতারত্ব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অর্থকেন্দ্রিক ও পৈশাচিক পথেই প্রকট হতো। ফলত বিপ্লবীদের কাছে তাঁরা বধ্য বলেই বিবেচিত হতেন। কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলক্রমে অন্য এক ইংরেজকে হত্যা করেন ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী। প্রফুল্ল আত্মহত্যা করেন। ১৯০৮-এ ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে স্বাধীনতার জয়গান গেয়ে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। সে সময় সুভাষচন্দ্র বিদ্যালয়ের ছাত্র। এ দিনটি বালক সুভাষচন্দ্রকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় বিপ্লবের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র মেদিনীপুর তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার নামে সমান্তরাল জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪২ থেকে ৮ আগস্ট ১৯৪৪ পর্যন্ত বিপ্লবীদের শাসন ব্যবস্থা এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র সামন্তের নেতৃত্বে সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল ও তমলুকে এই সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিল। ২৯ আগস্ট তমলুকে থানা দখলকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী, ভূষণচন্দ্র জানার মতো আত্মনিবেদিত তরুণেরা বলিপ্রদত্ত হলেন সেনাদলের গুলিবর্ষণে।

বালক ও মহিলাদের নেতৃত্বে ছিলেন তিয়াত্তর বছরের মাতঙ্গিনী হাজরা। বালবিধবা এই অসামান্যা নারী ১৯৩০-৩২-এ লবণ সত্যাগ্রহে অংশ নিয়ে গান্ধীবুড়ি নামে খ্যাত হয়েছিলেন। অজয় মুখোপাধ্যায়কে নেতা মানতেন এই বীরাঙ্গনা। তমলুকের বানপুকুরের পাড়ে সৈন্যদলের গুলিতে তাঁর বাম হাত আক্রান্ত হলে মুহূর্তে ডানহাতে পতাকা তুলে ধরেন। ডান হাত গুলিবিদ্ধ হলেও দৃঢ়ভাবে পতাকাকে তুলে ধরে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে দৃপ্তপদে সামনের দিকে অগ্রসর হন। তৃতীয় গুলি কপালে বিদ্ধ হলে তিনি প্রিয় দেশের মাটিতে ভূমিশয্যা গ্রহণ করলেও পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে রাখেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে প্রাণ দিয়েছিলেন দুই বালক লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ও পুরীমাধব প্রামাণিক এবং দুই যুবক জীবনচন্দ্র বেরা ও নগেন্দ্রনাথ সামন্ত। বিপ্লবীদের মেদিনীপুর তথা তমলুকে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে 'বাংলাদেশের ইতিহাস'-এর চতুর্থ খণ্ডে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক :

'১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে সারা ভারতে যে অহিংস ও সহিংস আন্দোলন হয় তাহাতে বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীগণ শীর্ষস্থান অধিকার করে। কালানুক্রমে চট্টগ্রাম বিপ্লবের পরে হইলেও লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী বিবেচনা করিলে আগস্টের এই আন্দোলনই ইংরেজ শাসনকালে বঙ্গদেশের সর্বপ্রধান হিংসাত্মক বিদ্রোহ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। চট্টগ্রামেও বর্বরোচিত অত্যাচার হইয়াছিল, তবে তাহা সংখ্যায় সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এরূপ ব্যাপক লুণ্ঠন, গৃহদাহ, অমানুষিক অত্যাচার ও পাইকারি নারীধর্ষণ প্রভৃতি সেখানে হয় নাই।'

আগস্ট আন্দোলন যে অহিংস মিশ্রিত ছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই আন্দোলনকে ব্রিটিশ সরকারের চরম সংকটের সৃষ্টি করেছিল তা সম সময়ের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলকে লেখা গোপন টেলিগ্রামে বড়লাট লিনলিথগো ৩১ আগস্ট, ১৯৪২-এ স্পষ্ট করেছেন এভাবে :

'I am engaged here in meeting by far the mont serious rehellion since that of 1857, the gravity and extent of which we have so far concealed from the world for reason of military security.'

এই মহান আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে জওহরলাল নেহরু খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। উন্মত্ত ক্রোধান্ধ মানুষদের উন্মাদ আচরণ ছিল এই আন্দোলন--- এইমত নেহরুর। তাঁর কথায় 'Impromptu frenzy of the mob.' এও বাহ্য। পট্টভি সীতারামাইয়াও কম যান না। তিনিও প্রায় সম উচ্চারণ করেন এভাবে : 'People grew insensate and were maddened with fury.'

আসলে গান্ধী-নেহরু কথিত তথাকথিত

অহিংসার সঙ্গে সহিংস আন্দোলন মিশ্রিত হয়েছিল। একের সঙ্গে অন্যকে বিশেষ বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব ছিল না। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এই অভিমত যথার্থ 'Indissoluble and indistinguishable admixture of gandhian spirit of nonviolent mass resisance and the revolutionary programme besed on violence.

এ কথা মনে রাখা দরকার, গান্ধীজী কিন্তু আন্দোলনে নেতৃত্ব দেননি, ব্রিটিশ সরকার একেবারে শুরুতে তাঁকে গ্রেপ্তার করায়। কিন্তু বহু মানুষ তাঁর নামে জয়ধ্বনি করে অহিংস-সহিংস নানা ভাবে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

যে কমিউনিস্টরা অনেক তাত্ত্বিক কথা বলেন তাঁদের কী ভূমিকা ছিল ভারত ছাড়ো আন্দোলনে? কমিউনিস্টরা ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। কারণ মতাদর্শগত বাধ্যবাধকতা। ইংল্যান্ড ও রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্র থাকায় এ দেশের কমিউনিস্টরা ব্রিটিশ বিরোধিতায় নামেননি। তবে পুঁজিবাদী বিরোধী মনোভাবের কারণে শ্রমিক সংগঠন টিস্কোতে তেরো দিন ধর্মঘট করে। এছাড়া দেশের বড়ো শহরগুলোতে তাঁরা মতাদর্শগত আন্দোলনেই সীমায়িত রাখেন নিজেদের। এ দেশের কমিউনিস্টরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শবাদ ও ধর্মীয় বিষয়গুলিকে যথোচিত মূল্যও দেননি। যেভাবে ক্রিস্টোফার হিল ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধে পিউরিট্যানিজমের ভূমিকা নিয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেননি। কমিউনিস্টরা তিলক, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দকে বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ যে রাষ্ট্রীয় মতবাদ তৈরি করেছিলেন তা বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, লালা লাজপৎ রায়ের মতো বিপ্লবীদের মানস গঠনে সহায়তা করেছিল।

পৃথিবীর সর্বত্র সদ্যোজাত জাতীয়তা তার প্রাণশক্তি সংগ্রহের জন্য অপেক্ষাকৃত প্রবীণ জাতীয়তাবাদী শক্তির কাছে প্রেরণা খোঁজে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যপুষ্ট প্রেরণা লাভের পর নিজের অতীত ঐতিহ্যের ভাবসম্পদকে আত্তীকরণ করতে চায়। যুক্তিবাদী ও সর্বজনগ্রাহ্য মানদণ্ডের নিরিখে স্বদেশের অতীত ফেলে আসা ঐতিহ্যের গুণকীর্তন করতে চায়। ভারতীয় জাতীয়তাবোধও এর ব্যতিক্রম নয়। দেশপ্রেমিকেরা সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রাচীনতম গ্রন্থের মধ্যে আত্মশক্তির সন্ধান করলেন।

বেদের মধ্যে রয়েছে পরম ব্রহ্মের উপলব্ধি। পরম ব্রহ্ম থেকেই উৎসারিত হয় ব্যক্তির মনন, অনুভূতি। বেদ নির্দেশিত পরম ব্রহ্মের সহনীয় উপস্থিতি ভারতীয় সভ্যতার অন্যতম ভিত্তিভূমি। সনাতন মানসিকতায় রয়েছে পুরাণতন্ত্রের অমোঘ প্রভাব। শিক্ষিত ভারতীয়দের বেশিরভাগই বিশ্বাস করতেন যে বেদের সারাৎসার রয়েছে গীতায়। ভারতীয় চরমপন্থী আন্দোলনে বিশ্বাসীরা তাই গীতাকেই বিপ্লবের জীবনবেদ বলে মেনে নিয়েছেন। তিলক গীতার পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে লিখলেন 'গীতা-রহস্য'। উর্দুতে রাষ্ট্রনায়ক ও দার্শনিক শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথা লিখলেন লালা লাজপৎ রাই। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব', অশ্বিনীকুমার দত্তের 'ভক্তিযোগ'-এর প্রেরণা ছিল গীতা। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব বলাবাহুল্য এক্ষেত্রে অনতিক্রম্য। ফরাসি বিপ্লবীরা প্লুটার্কের জীবনী পড়ে যেমন লিওনিডাস, সিনসিনেটাসের মধ্যে আদর্শের সন্ধান করতেন, তেমনি এ দেশের বিপ্লবীরা ভগবান কৃষ্ণ, পিতামহ ভীষ্ম ও তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের মধ্যে বীর আদর্শ খুঁজতেন।

জীবনসংসক্ত ও গৃহী শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ নেতৃত্ব ও দূরদৃষ্টি তো চরমপন্থী আন্দোলনের অন্যতম ভিত্তিভূমি ছিল। ভগবান কৃষ্ণ চেয়েছিলেন ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষুদ্র রাজ্যের বিলোপ ঘটিয়ে এক বিশাল ধর্মরাজ্য স্থাপন করতে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র অদ্বৈতবাদের সঙ্গে কৃষ্ণতত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' ধর্মতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব। তিনি মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রতিপন্ন করেছেন। 'বীরদর্প' সহকারে কৃষ্ণচরিত্রের সাহায্যে অমৃতের পুত্রদের ক্লীবত্ব ত্যাগে উদ্বোধিত করেছেন। বঙ্গিমচন্দ্র বিশ্বাস করেন ঈশ্বর হলেন স্রষ্টা, ত্রাতা ও সংহারক। প্রকৃতির সন্তান মানুষও অন্যান্য প্রাণীদের মতো অসম্পূর্ণ। কিন্তু মানুষ যদি গভীর ধ্যানে অন্তরে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করে তাহলে সেই অপূর্ণতা দূর হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই সাধনাই অনুশীলন তত্ত্ব। বলাবাহুল্য এই তত্ত্ব বিপ্লবীদের স্বদেশ ভাবনায় গভীর ভাবে প্রণিত করেছিল। বঙ্কিম প্রচারিত জাতীয়তার মধ্যেই কংগ্রেসের নরমপন্থার বিপরীত স্রোত খুঁজে পেয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ আনন্দমঠে দেশমাতার দ্বিসপ্তকোটি ভুজৈর্ধৃত খর করবাল তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।

ভগিনী নিবেদিতার 'কালী দ্য মাদার'ও যেন এক নতুন কালের বার্তা নিয়ে আসে শ্রীঅরবিন্দের কাছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করেছিলেন কার্জন। কংগ্রেসের আবেদন নিবেদন নীতি, অভিজাত ভিক্ষা বৃত্তির বিপরীতে দাঁড়িয়ে সেদিন ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবোধকে চড়া সুরে বেঁধেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। 'আনন্দমঠ', 'কালী দ্য মাদার' ছাড়াও তিলকের 'শিবাজী উৎসব' তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। পরবর্তীকালে বাজি প্রভুকে নিয়ে লেখা বীরগাথায় তিনি ভবানীর যে বোধন করেছিলেন ত প্রকাশিত হয় 'কর্মযোগীন্' পত্রিকায়। ১৯১০-এ তিনি লিখেছিলেন—

'We but employ

Bhavani's strength, who is an arm of flesh

Is mighty as in the thunder and the storm.

Chosen of Shivaji Bhavan's swords

For you the gods prepare.'

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দের অবদান অনস্বীকার্য। হিন্দু জাতীয়তাবোধ যা আক্ষরিক অর্থেই ভারতীয় জাতীয়তাবোধ তার অন্যতম উদ্‌বোধক ছিলেন তিনি। যে কালিকা মূর্তি বাঙ্গলার বিপ্লবীদের কাছে ব্রিটিশ শক্তিঘাতী প্রলয়ঙ্কর শক্তি বলে বিবেচিত হতো, তা বাঙ্গলার বাইরের বিপ্লবীদেরও বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

কিন্তু মেধাবী দেশনেতারা জানতেন

অতীতের শাস্ত্রবর্ণিত কোনো যুগন্ধর ব্যক্তি বিপ্লবীদের উৎসাহিত করলেও তা একমাত্র উপায় নয়। বরং মাটির পৃথিবীর রক্তমাংসের কোনো প্রতিঘাত চঞ্চল সমর নায়কের প্রয়োজন। ১৮৭৮-এ রমেশচন্দ্র দত্তের 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' প্রকাশিত হয়েছে। দু-দশকের মধ্যে শিবাজীর বন্দনা গান মহারাষ্ট্রের বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করে গোটা দেশকে প্লাবিত করবে। শুরু হবে দেশব্যাপী শিবাজী উৎসব। ছত্রপতি শিবাজী যে দুর্ধর্ষ মারাঠা গেরিলা বাহিনী নিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে দ্রুততর করেছিলেন তা লোকগাথায় পরিণত হয়েছিল। ভাগোয়া ঝান্ডাকে কেন্দ্র করে এক ধর্মীয় উন্মাদনা নির্জীব, মৃতপ্রায় মারাঠী জাতির জীবনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। শিবাজী মহারাজের উত্তরসূরীরা হিন্দু রাজ্য স্থাপনে ছিলেন দৃঢ়চিত্ত। তাই মুঘল-পতনের আক্রমণের অভিমুখ ঘুরে যায় ইংরেজদের দিকে। ছত্রপতি মহারাজের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয় আধিপত্যে ছিল না ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। বৃহত্তর এক আদর্শের জন্য সেই সাম্রাজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল।

বালগঙ্গাধর তিলক শিবাজী উৎসব পালনে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন মালব্যের মতো নরমপন্থীরা শিবাজী মহারাজের মধ্যে কেবল দেশপ্রেমই পেয়েছেন, কিন্তু তিলক এতে হিন্দু পুনরুজ্জীবন ও জাতীয়তাবোধ হিসেবেই দেখেছেন। ১৯০৪-এ 'শিবাজী উৎসব' রচনা করে রবীন্দ্রনাথ মারাঠা বীরের আদর্শকে বঙ্গদেশে সর্বত্রগামী করতে চেয়েছিলেন।

ভগবান কৃষ্ণ যিনি দুষ্কৃতী বিনাশের জন্য যুগ যুগ ধরে অবতীর্ণ হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, বিপ্লবীরা তাঁকেই স্মরণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণকে শরণ করা হয়েছিল ক্ষুদ্র খণ্ড ভারতবর্ষকে ধর্মরাজ্যপাশে আবদ্ধ করার জন্য। ফলে হিংসা অহিংসা এই ভেদাভেদ প্রাধান্য পায়নি। অদ্বৈতবাদ ও গীতায় যা ব্যক্ত হয়েছে তার মূল হলো মানবিক প্রেম। এ হলো বিবেকানন্দের কথা। পরাধীন দেশ, অন্ধবিশ্বাস দেশবাসী তাঁকে বিপুলভাবে বেদনাহত করত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত এই যুগপুরুষ দেশকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। পরাধীন ভারতবর্ষকে 'আমার শিশু শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী' বলে তিনি অভিহিত করেছেন। দেশবাসীর জন্য তাঁর উদাত্ত আহ্বান— 'ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।'

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসের সন্তানদলের দেশহিত মনোভাবের সঙ্গে বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধের উপসংহার গভীর সাদৃশ্যবাহী। এ দেশের বিপ্লবীরা তাই বিবেকানন্দ দ্বারা তীব্র ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি নরনারায়ণ সেবার মধ্য দিয়ে বহু বিভক্ত হিন্দু সমাজকে একটি ঐক্যবদ্ধ রূপ দিতে চেয়েছিলেন। সাধারণ মানুষকে হিন্দু ধর্মের ত্যাগ ও সহনীয়তায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। শিবানন্দকে লেখা চিঠিতে বিবেকানন্দ বলেছিলেন—

'তোমাদের পার্লামেন্ট, সিনেট, তোমাদের নির্বাচন, ভোটাধিকার, সংখ্যাগরিষ্ঠতা সব কিছুর সঙ্গেই আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে, কিন্তু বন্ধু, সর্বত্র এদের ইতিবৃত্ত ও পরিণাম একই। সব দেশে পরাক্রান্ত মানুষই নিজের ইচ্ছানুসারে সমাজ বাবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, বাকি সবাই ভেড়ার পালের মতো নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার।'

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভাবিত বিপিনচন্দ্র পাল স্বদেশি আন্দোলনকে অধ্যাত্মিকতার অংশ হিসেবে মনে করতেন। বেদান্তের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে মানুষের মধ্যে যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে সেজন্য স্বাধীনতা অন্তরের প্রতিরূপ, ঈশ্বরের অংশ।

স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল নানা মতাদর্শের সম্মিলিত প্রয়াস। গান্ধীজীর অসাধারণ জনপ্রিয়তা, নেতৃত্বদান যেমন আন্দোলনের অংশ ছিল, তেমনিই বিকল্প পন্থাও কম সক্রিয় ছিল না। আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্ব গাথা যখন প্রকাশিত হয় তখন দেশের মধ্যে যে চরম উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল তা সেই মুহূর্তের প্রায় নির্বাণোন্মুখ ব্রিটিশ শক্তিকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। সেনাদের সঙ্গে সমগ্র দেশের মানুষের এই বিদ্রোহ স্বভাবতই শৃঙ্খলিত ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর গভীর অস্বস্তির কারণ হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমের বিপুল প্রচার ছিল মূলত গান্ধীজী-নেহরুদের মতো নেতারাই লড়াই করে ইউনিয়ন জ্যাককে সরিয়ে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। স্বাধীনতার পর পরবর্তীকালেও দ্বিতীয় গান্ধী, তৃতীয় গান্ধী, এমনকী জনবিচ্ছিন্ন চতুর্থ গান্ধীকেও দেশত্রাতা হিসেবে প্রচারের এক প্রাণান্তকর অপচেষ্টা দেখা যায়। এ সবই এক ধরনের ধারবাহিক প্রক্রিয়ার ফল। ভারত ছাড়ো আন্দোলন সংক্রান্ত প্রচারের বিপুল আয়োজনও তারই এক বিকৃত দিক। অহিংসা মহান ধারণা সন্দেহ নেই, কিন্তু স্বাধীনতার জন্য সংহিস পদ্ধতি আরও বেশি মহনীয়। বাস্তবও।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. অমলেশ ত্রিপাঠি— স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।

২. সুমিত সরকার— মডার্ন ইন্ডিয়া।

৩. ড. আর.সি. মজুমদার— অ্যাডভান্সড হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া।

৪. রমেশচন্দ্র দত্ত— দ্য ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া ইন দ্য ভিক্টোরিয়ান এজ।

৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পা)— ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসি অ্যান্ড দি ইন্ডিয়ান রেনেসাঁস।

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

।। চিত্রকথা ।। মহামানব মহানামব্রত ।। ৮ ।।

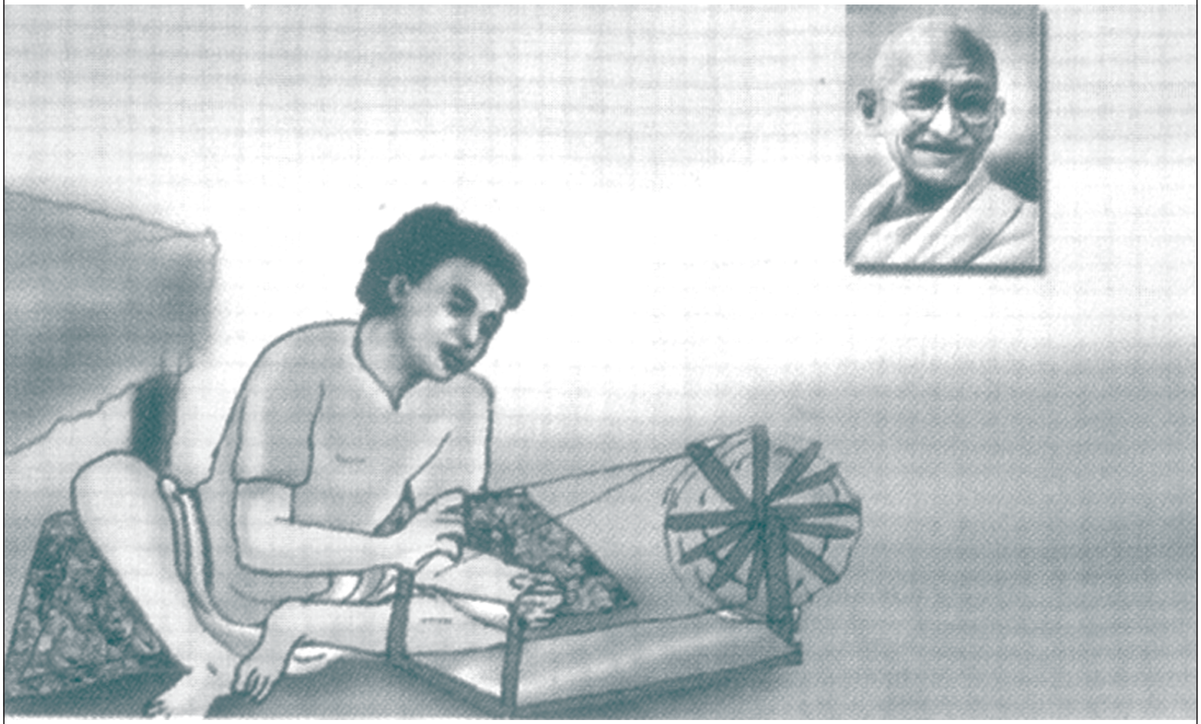

ইংরেজদের শাসনে তখন দেশের মানুষদের দিন কাটছে দুর্দশার মধ্যে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বললেন— এদেশে প্রকৃত শিক্ষা নেই। বঙ্কিম স্কুল ছেড়ে দিলেন। চরকা কাটা শুরু করে দিলেন।

ইংরেজি স্কুলে না গেলেও তাঁর কিন্তু পড়াশোনা বন্ধ হলো না। আশুতোষ কাব্যতীর্থের টোলে ভর্তি হয়ে তিনি সংস্কৃত পড়তে লাগলেন।

(ক্রমশ)